গ্রামকে গ্রাম

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা

"মহাযুদ্ধের ইতিহাস"-এর নতুন সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬
প্রকাশক
সুনীলকুমার সিংহ
ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
কলিকাতা
মুদ্রাকর
অবনী মোহন পাল চৌধুরী
জাতীয় মুদ্রণ
৭৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রচ্ছদসজ্জা
খালেদ চৌধুরী
বাঁধাই
শক্তি বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১২৬ বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা

দাম দু টাকা আট আনা

দোকান চলে। গ্রামখানি বড়।

ধরমতলায তবি-তরকারিব হাট বসে। ভিন্ন গ্রাম হইতে চাষার মেয়েরা মাথায় মোট লইয়া মবসুমি ফসল বিক্রি করিতে আসে। কিন্তু সম্প্রতি তাহারা আর আসিতে চায় না। গাঁয়েব কয়েকটা ছোকরা নাকি ভারি বজ্জাত।

মেয়েদের আসা বন্ধ হইযাছে। পুরুষেরা আসে।

কার্তিক মাস। মাঠেব নূতন বেগুন হাটে আসিযাছিল। খবব পাইযা গণেশ পাঁড়ে সেদিন নিজেই হাট কবিতে গেল।

বেগুনওযালাকে দেখাই যায না। গাঁয়েব মেযেবা তখন তাহাকে তাহার ঝুড়ি-সমেত ঘিবিয়া দাঁড়াইযাছে।

গণেশ তাহাব গোঁফ-জোড়াটা একবাব চুম্‌রাইযা লইযা জোব গলায হাঁকিল, "দর কত—দর কত হে বেগুনেব?"

জবাব আসিল না, সম্ভবত গোলমালে সে শুনিতে পায নাই।

"দেমাগ্‌ দেখ চাষাব! আবে—এই।"

চাষা মুখ তুলিযা চাহিল।

"দর কত? বেগুন?"

"তিন আনা ঠাকুব, তিন আনা সের!— ওগো, ওঠ ঠাক্‌রুণ, ওঠ তুমি। ফাউ পায না, তিনটি বেগুনেব ফাউ নাই।"

গণেশ বলিল, "তিন আনা কি, তিন আনা কি আবাব? সোনা-রূপো নয—মাঠের বেগুন।"

অন্য খরিদ্দারের বেগুন ওজন কবিতেছিল, ঘাড় নাড়িয়া চাষা বলিল, "হাঁ বাবু, তিন আনা। যুদ্ধুর বাজার আজকাল। ঝিঙের দরুণ সেদিনকার সেই চার আনা পাব তোমার কাছে।"

"পাবি তো কি পালিয়ে গেল নাকি রে হারামজাদা, চাষা !"

"গাল দিও না তুমি, গাল দিও না ঠাকুর। গবীব লোক আমাদের পয়সা ফেলে দাও।"

কথাটা সে একটু অপ্রিয়ভাবেই বলিয়া ফেলিল।

"আমার দুয়োরে এসে আবার আমাকেই জোব দেখ বেটার!" গণেশ পাঁড়ে অগ্রসর হইযা গিয়া ঠাস্ করিয়া গালে তাহাব এক চড বসাইযা দিল। "ভাগ্ শালা, ভাগ্!"

"মারবে নাকি তুমি?" বলিযা বুক ফুলাইযা চাষাও উঠিযা দাঁড়াইল।

কনৌজ ব্রাহ্মণ,—বহুদিন বাংলায় বাস কবিযা না হয বাঙ্গালীই হইয়া গেছে! গণেশ পাঁড়েব বুকখানাও কম চওডা নয। লাথি মারিযা বেগুনেব ঝুড়িটা সে উল্টাইযা ফেলিযা দিল।

লুট-করা মাল কুড়াইযা লইবাব লোকেব অভাব সেখানে ছিল না। মিনিট কযেকেব মধ্যে যে যাহা পাইল কুডাইযা লইল। গণেশ পাঁড়ে চালাক লোক। বচসা কবিল, হাঙ্গামা কবিল, লোকটাকে হাতেব সুখে ঘা-কতক বসাইয়াও দিল, মাল লুট করিল, আবাব সকলেব সঙ্গে নিজেও এক আঁচল বেগুন কুডাইয়া লইযা ঘবে চলিযা গেল।

চাষা মার খাইয়া কাঁদিতেছিল; দশজনকে শুনাইযা বলিল, "জমিদাবের কাছে যাই—এর বিচেব হোক।"

কে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, জমিদারের কাছে গিযা কোনও লাভ নাই। গণেশ পাঁড়ে ভয়ানক লোক।

থরমতলার হাট আব বসে না।

গ্রামের দক্ষিণে রেল-স্টেশন। দু-তিনটা বড় বড় কল-কারখানাও বসিল। হাট-বাজার দোকান-দানি লোকজনেব বাস-বস্তিতে জায়গাটা দিনে-দিনে বেশ জমকালো বকমেব হইয়া উঠিতেছে। গাঁযেব দক্ষিণ তরফ্‌টা ঘিরিয়া লইতে আর বেশি দেবি নাই।

পূব, পশ্চিম আব উত্তর,—এই তিনটা দিক এখনও ফাঁকা। চাষ-আবাদের জাযগা-জমিও বিস্তব। পশ্চিমে ছোট একটি নদীও আছে। কিন্তু পাকা ধান একবাব ঘবে ঢুকিলে সেদিকে আব কেহ ফিবিয়াও তাকায না, খোরাক বাদে অবশিষ্ট ধান-চাল শহবে বিক্রি কবিযা আসে, —জামা কেনে, জুতা কেনে, চুরুট ফোঁকে, মদ খায, গাঁজা টানে,—নিতান্ত অভাব হইলে কল-কাবখানায় সাড়ে বত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়া ফিটাব মিস্ত্রির কাজ শিখিতে যায। এ-গ্রাম হইতে তিনজন গিযাছে, কিন্তু সেই তিনজনেই তিনজন।

"আগে তিন ছিলুম গাঁজায় ভূত, চাব ছিলুম টানে কাব বাবাব সাধ্যি, আব এখন,—তিন ছিলুমই টানো, আর তিন-তিরিক্কে ন-ছিলুমই টানো বাছাধন, দেখতে-না-দেখতে নেশা হয়ে যাবে—ঠাণ্ডা জল। শালা লোহা-লক্কডেব এমনি বিছ্‌ছিবি শব্দ...দু-আনা রোজগার করতে গিয়ে চাব আনাই মাটি।"

কাজ হইতে ফিরিয়া মনু পৈতণ্ডি সেদিন ইহাই বলিল। কথাটা শুনিয়া অবধি অনেকেব উৎসাহ কমিয়া গেছে, এবং ইহার পরেও যে এ-গ্রাম হইতে আব কেহ সেখানে বেকুব্‌ বনিতে যাইবে—তাহার আশা-ভরসা খুবই কম। তবে সুসংবাদের মধ্যে এই যে, পচু গাঙ্গুলী গত বৎসর কালীয়দমনের যাত্রা শুনিতে গিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে যে হারমোনিয়ামখানি গায়ের-কাপড ঢাকা দিয়া রাতারাতি সরিয়া পড়িয়াছিল, অদ্যাবধি তাহার খোঁজ-খবর কিছু হইল

সম্প্রতি মেরামত করানো হইয়াছে, রাথহরি বোরেগীর খঞ্জনি, মন্দিরা—সবই মজুত, এই সব যন্ত্রপাতি থাকিতে গ্রামে একটি যাত্রা কিম্বা থিয়েটারের দল যে কেন চলে না, আজকাল তাহাবই পরামর্শ চলিতেছে। বেনোয়ারী ওস্তাদ পরের দলে ঠিকাচুক্তিতে বেহালা বাজাইয়া বেড়ায়, গ্রামে যাত্রার দল হইলে তাহার ঘর-বার দুই-ই হয়, কাজেই এ কাজে তাহাবই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। এমন কি দলটার একটুখানি নাম-ডাক হইযা পড়িলে বাত পিছু দু-এক টাকা সকলেই পাইবে,—নেশা-ভাঙ তো আছেই।

মহা উৎসাহে ছোকরাবা এখন চাঁদা আদায়ের খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ধবম্‌তলাব পাশে মস্ত বড যে গোলদাবি দোকানটি চলে, সেখানে কাগজ-কলম শেলেট্‌-পেন্সিল তো আছেই, আজকাল আবার কেমিকেলের গয়না, গেঞ্জি-মোজা, সাবান জরদা—সবই মিলিতেছে। এবং এই সবেব চলন হওয়াতেই নাকি সজনী মযরাব অন্ধকার খুপ্‌রির উপবেও ইটেব দোতলা উঠিল,—এমনি কথা অনেকেই বলাবলি কবে। কিন্তু কেনাবাম মুখুজ্যে বলে, "না হে না, উঠুক। দোতলা ছেড়ে তেতালাই উঠুক্‌ না! কথায় আছে, অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে,—আব সেই যে কি হে—অতি ছোট হযো না……। চুরির মাল-বেচা পয়সা বাবা—এমন তুমিও হতে পার আমিও হতে পারি।"

সেদিন সকালে কেনারাম মুখুজ্যে সেই দিক দিয়াই আসিতেছিল।

রোজ দু-বেলা তাহাকে এই দিক দিয়া একবার করিয়া আসিতে হয়। আফিংখোর মানুষ,—সকাল-বিকাল একটুখানি চা না হইলে চলে না। অথচ অনেক কষ্টে, তাহাদের দশজনের অনেক বলা-কওয়ার পর, মাত্র এই সেদিন—গত বৎসর পৌষ মাসে, দুরন্ত শীতের এক স্মরণীয় প্রাতঃকালে সজনী দত্তকে এই আফিং-এব অভ্যাসটি ধরানো হইয়াছে। তাহাবও চা-চিনিব অভাব নাই দোকানের চালাব খুঁটিতে ঠেস দিয়া চির-পুরাতন চটেব আসন-খানির উপর একবার চাপিযা বসিতে পাবিলে চাযেব ববাদ্দ কাহাবও ফাঁক পড়ে না। অন্তত কাঁশাব বাটিব এক বাটি করিয়া মিলিবেই।

কপিল চক্কোত্তি তখন সবেমাত্র তাহার কোঁচার খুঁটের উপব বসাইয়া, গবম কাঁশার বাটিটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। কি একটা ব্যাবামের জন্য কেনারামেব চোখের পাতা দিনবাত মিট্ মিট্ কবে, ভালো দেখিতেও পায় না। কপিলকে সে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। বলিল, "কে হে, বদ্দি? চারির জন্যে বিস্কুট আনতে দিলাম সেদিন তোমাব ভাইপোকে। পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট এনেছে। বলি, ওহে সজনী, শোন শোন, পাঁচ আনায় তিনটি বিস্কুট, তোমবা দোকানদার মানুষ—শুনেছ কখনও।"

চারিদিকে অগোছালো জিনিসপত্রের মাঝখানে বসিয়া সজনী খরিদ্দাব বিদায় করিতেছিল। বলিল, "চারুর আবার কি হল মুখুজ্যে?"

দরজার এক পাশে পিতলের একটি ঘটিতে কেনারামের জন্য চা ঢাকা ছিল, বাটির উপর ধীরে ধীরে চাটুকু ঢালিয়া বলিল, "জ্বর—"

ভিতর হইতে জবাব আসিল, "হুঁ মুখুজ্যে, জ্বর আজকাল সবারই। আমাদেরও চার-পাঁচটা ছেলে লট্-পট করছে।"

কিন্তু এক চুমুক চা মুখে দিয়াই কেনারামের মুখখানা কেমন যেন এক রকমেব হইয়া গেল, বলিল, "সজনী, এ কি হে, চা যে তোমার ঠাণ্ডা জল! না আছে মিষ্টি না আছে—"

সজনী একটুখানি আশ্চর্যান্বিত হইয়াই বলিল, "সে কি মুখুজ্যে! ওই যে কপিল ঠাকুরের চায়ে 'ভাপ' উঠছে এখনও!"

কপিলের বাটির উপর তখনও ধোঁয়া উঠিতেছিল, কেনারাম তাহা দেখিতে পায় নাই। এইবাব ভালো কবিয়া তাহার মিটমিটে চোখ দুইটাকে একটুখানি চাড়া দিয়া কেনারাম সেইদিক পানে তাকাইল। বলিল, "কে? কপলে নাকি? তবে আর বলতে হবে কেন সজনী, শালা ও-পাড়া থেকে এসেছে এই পাড়ায় চা মারতে। দিয়েছে হযতো আমাব চাযে জল ঢেলে বাড়িয়ে।"—বলিয়াই সে আর-এক চুমুক ঢুক্ কবিয়া গিলিযা বলিল, "হুঁ, ঠিক—"

কপিল চক্কোত্তি লোকটা একটুখানি ক্ষ্যাপাটে-গোছেব, বয়স কম নয—পঞ্চাশের কাছাকাছি, সজনী কেনাবামেব চেয়ে কিছু বডই হইবে। কিন্তু দেখিতে অত্যন্ত বেঁটে, মুখে একবাশ দাড়ি-গোঁফ চেহাবাটা নিতান্ত খাবাপ।

ঘরে বৌ আছে। বৌ ভাবি দজ্জাল।

ছেলে পুলে হয় নাই। হইবাব আশাও নাই।

বৌ বলে, "বসে বসে ভাত খাবি তো দু-কলসি জল নিযে আয় পুকুর থেকে।"

পিতলের বড় বড দুইটা কলসি লইয়া কপিল স্নান করিতে যায়।

চা খাইতে চাহিলে বলে, "লাট-সায়েবের মুরোদ কত? কাবও ঘরে খেগে যা।"

দুধ-চিনি না পাইলে অন্তত নুন দিয়াও গরম চায়ের জল

একটুখানি গ্রামের প্রায় সকলেই খায়। কপিলেরও বাদ পড়ে না। যেখানে যায় অন্তত জোর-জবরদস্তি করিয়াও একটুখানি খাইয়া আসে। অনেক চেষ্টা করিয়াও গরম চা-টুকু কপিল তখনও পর্যন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

কেনারাম বলিল, "হারামজাদা এ-পাড়ায় মরতে কেন তুই,—এ-পাড়ায় কেন?"

কপিল এতক্ষণ কথা কহে নাই, একমনে চা খাইতেছিল। এইবার ফিক্ করিয়ে একবার হাসিয়া ফেলিল।

কেনারামের তখন আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে আর রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না; চায়ের বাটিটা কপিলের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে শালা নে, তবে তুই-ই খা।"

বাটিটা ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল, কপিলের কাপড়টাও ভিজিয়া গেল। তা যাক। ইহার জন্য গরম চা ছাড়িয়া ওঠা যায় না। কপিল উঠিল না। বাটির অবশিষ্ট চা-টুকু নিঃশব্দে শেষ করিয়া বাটিটি সেইখানে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "নে কেনারাম, ধুয়ে রাখ।"

একে সে রাগিয়াই ছিল তাহার উপর কপিলের এই কথাটা শুনিবামাত্র সে তাহাকে মারিতে গেল।

কপিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাস্তায় গিয়া নামিল, বলিল, গাড়ুর জলটা তো খেলি।"

রাগে কেনারামের চোখের পাতা দুইটা ঘন ঘন নড়িতেছিল। বলিল, "বামুন-ঘরের গরু—।" রাগে তাহার আর কথা বাহির হইল না, চোখের পাতার সঙ্গে ঠোঁট-দুইটাও নড়িতে লাগিল।

ব্যাপারটা দেখিবার জন্য দোকানের ভিতর হইতে সজনী ও

তাহার কয়েকজন খরিদ্দার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভুবন স্যাকরা কয়েক পয়সার সুপারি খরিদ করিয়া সেগুলি তখনও বাঁধিবার অবসর পায় নাই, তাহাই সে তাহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল "কপিলের বাপ একজন পণ্ডিত ছিল গো—সংস্কিতো জান্‌তো।"

আর একজন কে বলিল, "আর ওই তার ছেলে।"

কথাটা শুনিয়া রাস্তার উপর হইতে কেনারামকে উদ্দেশ করিয়া কপিল বলিতে আরম্ভ করিল, "কেনা, কনৌ, কেনাঃ—কেনাম, কেনে, কেনাঃ—কেনেন, কেনাভ্যাম্, কেনেভ্যঃ।"

এবং ইহাই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল।

কেনারাম ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল; সজনী দত্ত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কর কি মুখুজ্যে, ও কি মানুষ?" একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, 'বৌকে লুকিয়ে ভাতের চাল চুরি করে আনে—এনে ছোলাভাজা কিনে, খায়। ওরে ও জগন্নাথ! তোর মাকে বল তো বাবা, মুখুজ্যের জন্যে আর একবার চায়ের জল চড়িয়ে দিক।"

কথাটা শুনিয়া এতক্ষণে মুখুজ্যে-মহাশয়ের যেন ধাত আসিল; পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিল, "শালা ক্যাপা, শালা ক্যাপা, ক্যাপা রয়েছে শালা আসল বদমায়েস।"

সুমুখের রাস্তা দিয়া ঝুড়ি মাথায় করিয়া একটা লোক পার হইয়া যাইতেছিল। কেনারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কী তরকারি হে, কী তরকারি? নামাও না বাবা!"

লোকটা চলিতে চলিতে জবাব দিল, "এ তরকারি খেতে পারবেন না বাবু—"

"কি এমন তোমার কপি-মূলো আছে হে, যে খেতে পারব না? নামাও, নামাও—কেউ মার-ধোর করবে না—নামাও।"

বলিতে বলিতে কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া গিয়া তাহার ঝুড়ির পিছনের দিক ডান হাতটি দিয়া টানিয়া ধরিল।—"শালা গণেশ পাঁড়ের দায়ে হাটটি উঠে গিয়ে আমাদের এই জ্বালা!"

"মুরগীর ডিম আছে বাবু, এই দেখুন না।" বলিয়া লোকটা তাহার মাথা হইতে ঝুড়িটি নামাইল।

কেনারাম মুখুজ্যে লাফাইয়া উঠিল।

"মুরগীর ডিম!"

"হাঁ বাবু, ইস্টিশনে সায়েবদের জন্যে।"

"মুরগীর ডিম তো এ রাস্তায় কেন? এই বামুনের গাঁয়ের মাঝে-মাঝে, এই ঠাকুরস্থাবতার থানের উপর দিয়ে—?"

কেনারাম মুখুজ্যের চোখের পাতা দুইটা যেন সেকেণ্ডে দশবার করিয়া উঠা-নামা করিতে লাগিল।

লোকটি পুনরায় ঝুড়িটি মাথায় তুলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কেনারাম মুখুজ্যে বাধা দিয়া বলিল, "না, না, সেটি হচ্ছে না বাপ্‌ধন, দাঁড়াও। সকালবেলায় মুরগীর ডিম ছুঁইয়ে তো আমার চান ঘটালে, তার উপর আস্পর্দাও তো তোমার কম নয় বাবা! দাঁড়াও—ওরে কে আছিস্ এখানে, ডাক্ তো গণেশ পাঁড়েকে!"

"গণেশ পাঁড়েকে কেন? এই যে আমরা রয়েছি।" বলিয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহার মাথা হইতে যাত্রার দলের দরুণ আদারী চাউলের ডালাটি নামাইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল লোকটা বুঝি তরকারি বিক্রি করিতে আসিয়া দাঁও

বুঝিয়া চড়া দাম হাঁকিয়াছে। বলিল, "ও-সব চলবে না কত্তা, এ-গাঁয়ে এক দর।"

এ-পাড়ার ও-পাড়ার আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণের ছোকরা, যাত্রার দলের চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতেছিল। হরেকৃষ্ণর পশ্চাতে তাহারাও আসিয়া পৌঁছিল।

বাথহরি পাঠক পশ্চিম-পাড়ার লোক। বলিল, "চল হে চল, আমাদের পচ্ছি-পাড়ায় চল।"

পান্নু গাঙ্গুলী বলিল, "যাইবি আর-কি। না হে না, তার চেয়ে চল আমাদের মনসা-ঘরে,—সাধারণী-জায়গা বাবা কেউ টুঁ শব্দটি করবে না।"

কেনারাম মুখুজ্যে বেগতিক দেখিয়া বলিয়া উঠিল "আ—মলো যা! আচ্ছা বেকুব তো তোরা। এঁড়ে না বক্না আগে ভালো করে দেখ না রে বাবা, তারপর কথা কইবি। মুরগীর ডিম এনেছে বেচতে, তা জানিস্?"

"মুরগীর ডিম!"

এক সঙ্গে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল।

কেনারাম মুখুজ্যে বলিল, "তবে আর বলছি কি শালাকে। এই বামুনের গাঁ, তার উপরে আবার এই শবম্‌তলা……"

"ওই! তবে মারো হে শালাকে।" বলিয়া বাথহরি পাঠক দূরে দাঁড়াইয়া নাক ঝাড়িতে লাগিল।

পান্নু গাঙ্গুলী সায় দিয়া বলিল, "হাঁ ঠিক। দাও সেই চাষার মতন করে।"

হরেকৃষ্ণ তাঁতি বলিল, "তার চেয়ে কিছু অর্থদণ্ড হোক।"

"তবে তাই কর যা-খুশি, কিন্তু ষোল-আনার কম ছেড়ো না তা বলছি।" কেনারাম মুখুজ্যে একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল।

সজনী ময়রা পুনরায় দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, বলিল, "গরীব লোক,—যা বেটা তবে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে ওই বাবা-ধর্মরাজকে পেনাম করে যা, বল, আর কখনও এ কাজ করব না।"

এতগুলো লোকের ব্যাপার দেখিয়া ডিমওয়ালা ভ্যাবাচ্যাকো খাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাখহরি পাঠক আগাইয়া আসিয়া বসিল, শুধু জরিমানা নয়, নাক্খৎ দাও আড়াই-হাত।"

"তবে এই চার গণ্ডা পয়সা লেন বাবু।" বলিয়া অতি কষ্টে লোকটি তাহার কোঁচড় হইতে দুইটি দু-আনি বাহির করিয়া সজনী ময়রার হাতে দিয়া তাহাকেই একটি প্রণাম করিল।

"আমাকে পেনাম করে না, যাও, আর রামপাখীর ডিম-ফিম্ নিয়ে এস না এ-গাঁয়ে।"—বলিয়া সজনী দত্ত দুয়ানী দুইটি কেনারাম মুখুজ্যের হাতে দিয়া পুনরায় দোকানে গিয়া ঢুকিতেছিল, জগন্নাথকে চা আনিতে দেখিয়া বলিল, "দাও মুখুজ্যেকে দাও।"

বাখহরি পাঠক হাত পাতিয়া বলিল, "পয়সাগুলি ট্যাঁকে গুঁজো না মুখুজ্যে—দাও গাঁজা আনি।"

চোখ মিট্‌মিট্ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া কেনারাম বলিল, "না রে না, গাঁজা আনে না, সাধারণীর পয়সায় গাঁজা আনে না।"

পান্নু গাঙ্গুলী বলিল, "বেচু ময়রা বেগুনি ভাজছে গরম গরম—"

"সেই ভালো।"

কেনারাম এক হাতে চায়ের গ্লাসটি ধরিয়া অন্য হাতে দু-আনি দুইটি রাখহরির পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল।

রাখহরি সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলিল, "না মুখুজ্যে, দুই-ই আসুক্,—দু-আনার তেলে-ভাজা, আর দু-আনার—"

চায়ের গ্লাসে বারকতক ফুঁ দিয়া কেনারাম একবার রাখহরির দিকে সহাস্যে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তবে তু-ই যা, কিন্তু ভালো দেখে বেশ সোঁটা সোঁটা বেছে বেছে এক দু-আনি ওজন করে আনিস বাপু,—আব ওই বরি-বামনীর কাছে আনিসনি যেন—বেটি ভারি চোর।"

চুরি করিয়া গোপনে গাঁজা-আফিং বেচাব ব্যবসাটা তখন এ গ্রামে খুব জোর চলিতেছে।

চাউলেব ডালাটি সজনী ময়রাব দোকানের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া হরেকৃষ্ণ কেনারামের কাছ হইতে হাত খানেক দূরে গিয়ে উবু হইয়া বসিল। বলিল, "আজ আচ্ছা করেছেন মুখুজ্যে, এমনি না করলে কি আর গাঁ জব্দ হয়,—আচ্ছা করেছেন ডিমওয়ালাকে।" বলিয়া সে ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল। এবং কিসৎক্ষণ পরে তাহার সে হাসি থামিলে হাত বাড়াইয়া কহিল, "আপনাব ওই গেলাসের পেসাদ একটুখানি···মানে, বোজ সকালে আমার এক গেলাস করে চাইই, তবে কিনা বাসি দুধে চা তেমন সুবিধে হয় না। বুঝেছ গাঙ্গুলী—"

পানু গাঙ্গুলীকে উদ্দেশ কবিয়া আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তেলে ভাজার ঠোঙ্গা হাতে লইয়া রাখহরিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে সব বন্ধ হইয়া গেল।

রাখহরি বলিল, "দোকানে বসে ছিল শালা কপলে,—নিলে দুটো ঝাঁ করে তুলে।"

"তুই দিলি কেন ওকে?" বলিয়া গেলাসের অবশিষ্ট প্রসাদটুকু হরেকৃষ্ণর হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া, চোখের পাতা দুইটা মিটি মিটি করিতে করিতে কেনারাম একবার রাখহরির মুখের পানে তাকাইল।

"কী করব, এক হাতে এই—আব এক-হাতে এই"—বলিয়া রাখহরি তাহার ডান হাতেব ঠোঙ্গা ও বাঁ-হাতেব চোরাই পুঁটুলি দেখাইয়া দিল।

তেলে-ভাজাব ভাগ-বণ্টন পান্নু গাঙ্গুলী-ই কবিযা দিল। পোঁটলা খুলিয়া রাখহরি গাঁজা টিপিতে বসিল।

প্রসাদ পাইয়া হরেকৃষ্ণ তাঁতি তাহাব আনন্দেব উচ্ছাস আর দমন কবিতে পারিল না। সে আবাব বলিতে আবম্ভ করিল, "সে দিন হরেকুলি গেলাম একটা কাজে। শুনুন মুখুজ্যে, শুনুন! সন্ধ্যেবেলা। রেবতী পোদ্দাবেব সেই যে দোকানটা আছে, তাবই সামনে গাঁযেব সেই বাস্তাটাব এক পাশে ক-জন বামুণদেব ছোক্বা বসেছিলেন। বাশ গোসাঁইকে চেনেন তো? আমি গিযেছিলাম পাঁটা আনতে তাবই ঘবে। আমিও সেইখানে বসে। এমন সময হল কি,—কোথাকাব কে একটা লোক জুতো পায়ে দিযে মচ্ মচ্ কবে তাদেব সামনে দিযেই পেবিয়ে গেল। একজন জিজ্ঞেস কবলে, কোথা বাড়ী?"

'আজ্ঞে পড়াশ্ কোল্।'

'তোমবা?'

'আমবা শৌ-মণ্ডল।'

"শুঁড়ি, বেটাচ্ছেলে শুঁড়ি—বুঝেছেন কিনা! আব যায কোথা। তড়াক্ একজন উঠে গিযে ধববি তো ধব বেটাব একেবারে টুঁটিতেই। তা—পরে বাবু, মার তো মাব একেবাবে বেদম মার—জুতো খুলে দুমা-দুম্ দুমা-দুম্…বেটা শুঁড়ি! বেটার জল ছুঁলে পাচ্চিত্তি করতে হয়,—আব বেটা কিনা অতগুলি বামুণেব মাঝ দিযে, জুতো পরে পেরিয়ে গেল!"

"নোয়া শালা, মাথা নোয়া" বলে তো দিলে একজন ছোক্‌রা

হুম্ করে তার ঘাড়ে এক কিল মেরে মাথাটা নুইয়ে। বাস্! বেটা সাত হাত নাকখৎ দিয়ে সটান লম্বা হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে সেদিন উঠে গেল। সেই থেকে সব জব্দ,—বুঝেছেন মুখুজ্যে, হন্নেফুলির বামুনদের নাম শুনলে দশখানা গাঁ একেবারে টঁটরস্থ হয়ে ওঠে। বুঝেছেন?" বলিয়া সে হাতের গ্লাসটি নামাইয়া দিয়া গাঁজার প্রসাদ পাইল।

যাত্রাব দলের জন্য আদায়ী চালগুলি তাহারা সজনী ময়রার দোকানে বিক্রি করিতে আসিযাছিল। প্রসাদ পাইযা ডালাব চাল-গুলি মাপিবাব জন্য দোকানের ভিতর হইতে হবেকৃষ্ণেব ডাক পডিল।

গণেশ পাঁড়ের ছোট ছেলেটা তেলের একটি ছোট ভাঁড লইয়া সজনীর দোকানে তেল কিনিতে আসিযাছে।

বাহিরে বসিয়া রাখহরির বেগুনি-সেবা চলিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে এই ছেলেটাকে হাতের ইসাবা কবিযা বলিল, "এই ভ্যাঁটুরা! শোন্!"

ছেলেটা সেই দিক পানে ফিরিয়া তাকাইল।

রাখহরি তাহার বাঁ হাতেব ঠোঙ্গা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া হাত বাড়াইয়া ছেলেটাকে দেখাইল, বলিল, "খাবি? গরম বটে।"

ছেলেটা লজ্জায় মাথা হেঁট্ কবিয়া হাত বাড়াইল।

"ছাই খা, পিণ্ডি খা, গরু খা।" বলিয়া রাখহরি তাহার হাতের বেগুনিটি টুপ্ করিয়া নিজের মুখে পুরিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে—।

মুরগীর ডিম ছুঁইয়া স্নান করিবার জন্য কেনারাম মুখুজ্যে উঠিয়া

গেল। অন্যত্রে চাঁদা আদায়ের চেষ্টায় রাখহরি, পান্নু ও হরেকৃষ্ণ তখন চলিয়া গিয়াছে; এমন সময় গণেশ পাঁড়ে তার সেই ভ্যাঁটরা ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অত্যন্ত দ্রুতপদে সজনী ময়রার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথা—কোথা সব? কোথায় বেগুনি কবছে—কার ঘবে?"

দোকানেব ভিতব হইতে সজনী বলিয়া দিল, "আমাদের বেচাবামেব ঘরে দেখ পাঁড়ে।"

"বেচা। যাই শালা বেচাকে একবাব—বেগুনি কবা বার করছি, সকালবেলা ছেলে-কাঁদানো—চল্, চল্ বেটা চল্।" বলিয়া ভ্যাঁটরাকে আবাব টানিতে টানিতে গণেশ বেচাবামেব দোকানেব দিকে চলিতে লাগিল।

বেচু ময়রা তখন তাহাব বাস্তাব ধাবেব ছোট চালাটির এক পাশে বসিযা বেগুনি ভাজিতেছিল।

গণেশ পাঁড়ে হাঁকিল, "বেচা।"

উনান হইতে আগুন তুলিযা, কাশী তাজবা কলিকায় আগুন চডাইতেছিল, হাত হইতে তাহাব কলিকাটা কাঁপিয়া পডিয়া গেল। পাঁড়ে বলিল, "দেখ্ বেচা, 'এন্‌চ্যাণ্টমেণ্ট অভ চিল্‌ড্রেন্' বলে' যদি মাজেস্টরীতে দবখাস্ত কবি তোব নামে,—তোব দশাটা একবার কী হয় তা ভেবে দেখেছিস? দিন দিন বেগুনি ভাজা কি বল্ দেখি,—ছেলে-কাঁদানো দিন-দিন?

বেচু জাতিতে ময়রা, দোকান কবিয়া খায়, মানুষের মন ভুলাইতে জানে। অতি সত্বব হাতের ঝাঁজরাটি বেগুনির ঝুড়ির উপব রাখিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিল, তাহার পর নিজেব বসিবার চটখানা বাঁ হাতে সরাইয়া ফেলিযা বলিল, "বসুন, পাঁড়ে-মহাশয় বসুন।"

“না, আর বসব না। কিন্তু এই বলে রাখছি বেটা, বেগ্‌নি টেগ্‌নি আর করিস না। আমরা জাত কমুজ্যে, আমাদের রাগ ভারি খারাপ।” বলিয়া গণেশ চালার উপর চটখানা টানিয়া লইয়া চাপিয়া বসিল। ভ্যাঁটরা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিল, “বস্ বেটা, বোস্ ওইখানে। কাঁদিস্ না—বলছি, কাঁদিস না, কাঁদবি তো দেব এখুনি টুঁটি টিপে মেরে।” এই বলিয়া সে দন্ত ও হস্তের দ্বারা টুঁটি চাপিবার ইঙ্গিতটা তাহার ক্রন্দনরত পুত্রকে একবার দেখাইয়া দিল।

বেচু তাহার ডালি হইতে দুইটি মোটা মোটা বেগুনি তুলিয়া ভ্যাঁটরার হাতে দিয়া বলিল, “খান পাঁড়ে-মহাশয়, ততক্ষণ সেবা দিন—তারপর এই আর-এক ঝাঁক নামিয়েই—”

পুনরায় সে গরম তেলের উপর বেগুনি ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল, “তবে শুনুন পাঁড়ে ঠাকুর, শুনুন! খড় বলতে তো এক আঁটিও নাই আর এ-গাঁয়ে কারও। চড়া দাম পেয়ে তো সবাই হুঁ হুঁ। তাই বলি তো গরু-বাছুরগুলো তাহলে খায় কি? সেই জন্যেই বলি কিনা—দু-চারটে বেগ্‌নি ফুলুরি ভেজে রাখি—বাউরি-বাগদি ছোটলোকগুলো সব দু-চার বোঝা করে ঘাস দিয়ে যাবে, আর এই মদের সঙ্গে খাবার জন্যে দু-এক পয়সার তেলে-ভাজা—এই আর কি! বোঝেছেন কিনা পাঁড়ে ঠাকুর, দিন আপনার পায়ের ধুলো দিন চারটি।” বলিয়া হাত বাড়াইয়া পাঁড়ে ঠাকুরের ধূলি-সমাচ্ছন্ন পদতল দুইটি স্পর্শ করিয়া বেচু তাহার মাথায় ঠেকাইল।

কাশী হাজরার কলিকায় আগুন দেওয়া তখন শেষ হইয়াছে, দেওয়ালে টাঙানো ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট কড়িবাঁধা হুঁকাটি পাড়িয়া আনিয়া সে তখন পড়্ পড়্ করিয়া তামাক টানিতে টানিতে একেবারে হয়রান

হইয়া পড়িয়াছিল; অবশেষে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিনকার সেই মোকদ্দমাটার কী হল পাঁড়ে?"

পাঁড়ে বলিল, "কোন্‌টা? কোন্ মোকদ্দমাব কথা বলছিস? একটি মোকদ্দমা তো নেই আমার হাতে যে ঝপ্ করে বলে ফেলব—কি হল। সেই কাঙ্গাল সেখের দাঙ্গার মোকদ্দমা?"

"হাঁ হাঁ, সেই কাঙ্গাল সেখ—।" বলিয়া কাশী হাজবা আবাব তাহার হুঁকায় দম দিতে লাগিল।

পাঁড়ে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "এই গণেশ পাঁড়ে যে-তরপে দাঁড়ায়, সে তরপের কি আব হাব আছে বে কখনও বেকুব? কাঙ্গাল জিতলো। দাঙ্গায় দুটো মাথাও ফাটালে, আবাব ডিগ্রিও পেলে। ওরে ওসব অনেক কাণ্ড। মামলা-মোকদ্দমা কি আব সহজ জিনিস রে বাবা।"

কড়াই হইতে বেগুনি তুলিতে তুলিতে বেচু বলিল, "মাথা চাই, বোয়েছেন কিনা হাজরা ঠাকুব, ও-সবেব এক আলাদা মাথা।"

কাশী হাজরা বলিল, "তা বটে বাপু! মোকদ্দমার নাম শুনলে আমাদের মাথা ঘোবে, আর সেদিন সেই বলবাম মোড়লের জানি-চিনি দিতে গিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম কিনা, পাঁড়েব ভযে আদালত-সুদ্ধো কাঁপছে উকিল-মুক্তিয়াব তো বাপ্ বাপ্ ডাক ছাড়ে—।"

বেচু বলিল, "ও-ই, সে-কথা কি বলতে! আর—মামলা-মোকদ্দমার কথা আর বল না হাজরা, সে-বছর সেই ভাইপো করলে মামলা আমার নামে, আমি বলি আদালতে যাব না বরং সেই ভালো—একতরুপা ডিগ্রিই হোক্। গেলাম না। তা বাপু তুমি যাই বল, এই আদালত-ফাদালত করে কোন রকমে শাশিত্ করে রেখেছে এই দেশটাকে—না

কি বল পাঁড়ে ?"

পাঁড়ে খিঁক্ খিঁক্ করিয়া খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "শাশিত্ না আমার হয়ে করেছে বেচু। আইনের ফাঁকি বাবা সব—আইনের ফাঁকি, আর মার-প্যাঁচ। এল্—কোন্ শালার মাথা ফাটাতে হবে এ-গাঁয়ে বল্—আমি দিচ্ছি চ্যালা কাঠ্ দিয়ে দু-ফাঁক্ করে তোব সাক্ষাতেই। দেখি তা-পরে কি হয়,—ফুস্ আর ফাস্! এই গোঁফ জোড়া—দেখেছিস কিনা—" বলিয়া পাঁড়ে তাহার গোঁফে হাত দিয়া আবার বলিল, "এই গোঁফ—মা-বাপের ছাদ্ধের সময় ফেলিনি এই গোঁফ—মাথা কামিয়েছিলাম, দাড়ি কামিয়েছিলাম, কিন্তু এই গোঁফ কামাইনি বাবা! মবদ্—মবদ্ চাইরে বেচু, মবদ্ চাই! মরদ্ কোন্ শালা আছে এই গাঁয়ে—মবদ্? একথা তো হাঁক্ মেবে বলছি আমি,—কই, কোন্ শালা আস্ছে—আসুক্!"

"এই যে পাঁড়ে!"

বলরাম মিস্ত্রি সেই পথ দিযা পাব হইযা যাইতেছিল, পাঁড়েকে দেখিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কী খবব?"

মিস্ত্রি বলিল, "গাঁয়ে এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটে গেছে।"

উপস্থিত সকলেই তাহাব মুখেব পানে তাকাইয়া বহিল।

"কী ব্যাপার—?"

মিস্ত্রি বলিল, "একজন ডিমওয়ালা পেরিয়ে যাচ্ছিল সজনী দত্তর দরজা দিয়ে—"

"তারপর?"

"এক ঝুড়ি মুরগীর ডিম নিয়ে যাচ্ছিল ইস্টিশানে।"

কাশী হাজরা বলিল, "হুঁ। যায় বটে, দেখেছি। তারপর?"

মিস্ত্রি বলিল, "তারপর আর-কি, নিয়েছে ক-জন ছোকরা মিলে কিছু আদায় করে। আমাদের বেনোয়ারী ওস্তাদের দলটি ছিল, আর ছিলেন আমাদের কেনারাম মুখুজ্যে—"

বেচু ময়রা, মিস্ত্রিকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, গণেশ পাঁড়ে তাহাকে চুপ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কত আন্দাজ হবে ?"

"তা—লোকটা তো ভয়ে-ভয়ে বলছে এখন পাঁচ সিকে, কিন্তু পাঁচ সিকে তো আমার বিশ্বেস হয় না—আরও কিছু বেশিই হবে।"

গণেশ পাঁড়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মার-ধোর ?"

"তা কিছু হয়েছে বই-কি! আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন-গে না একটু উঠে গিয়ে। হাল্-হবিগৎ সবই টের পাবেন।"

পাঁড়ে বলিল, "কোথায়—কোথা গেল সে লোকটা ?"

মিস্ত্রি বলিল, "আপনার ঘরেই তো দিলাম পাঠিয়ে, তবে আর বলছি কেন ঠাকুর। রাস্তায় কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, আমি বলি তো আপনি হয়তো ঘরেই আছেন, তাই বললাম বলি, যা তবে, এর পিতি-বিধেন্ যদি-কিছু হয়, তো ওই পভুর কাছেই হবে।"

"তাই নাকি ? তবে তো উঠতে হয়!"

গণেশ পাঁড়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাড়াতাড়ি শালপাতার একটা ঠোঙ্গা তৈরী করিয়া কয়েকটি বেগুনি সমেত ঠোঙ্গাটি ভ্যাট্‌রার হাতে দিয়া বেচু বলিল, "যাও, সেবা দাওগে। পেনাম্। কিন্তু বোয়েছেন কিনা পাঁড়ে ঠাকুর, বেগুন আনলাম ইস্টিশানের হাট থেকে। চার-আনা সের। বলি, আচ্ছা তাই তা-ই। আমাদের এই ধরম্‌তলার হাটে তো আর উ-কম্ম নাস্তি। আচ্ছা করেছেন আপনি সেদিন সেই চাষাকে ঠেঙিয়ে।

বেটারা ভারি বজ্জাত।”

কাশী হাজরা বলিল, “আচ্ছা বেগুন বাবু সেদিনের। কিন্তু গোলমালে তিনটির বেশি আর পাওয়া গেল না।”

বলরাম মিস্ত্রি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “আমি কিন্তু আঁচল-ভর্তি নিয়ে গেছলাম দাদা, তা তোমরা যা-ই বল আর তাই বল। পাঁড়ের দৌলতে চারটি দিন পুরো দু-বেলা,—বেগুন ভাজা, বেগুনের তরকারি, বেগুনের চড়্চড়ি, মায় বেগুনের অম্বল।”

গণেশ পাঁড়ে থামিল। বলিল, “দেখ্লে তো সেদিন বেচু, বেটা আমার কী উল্‌টিয়ে নিলে? বলে-কিনা যুদ্ধুর বাজার। যুদ্ধুর বাজার তো তোর বেগুনে যুদ্ধ কিসের রে হারামজাদা! দিলাম ঘা-কতক বসিয়ে। অন্যায় সহ্য হবে কেন? আমরা জাত-কনৌজ্যে। আমাদেব রাগ ভারি খারাপ।—ওরে ও ভ্যাঁট্‌রা, নিজেই যে সব মেরে দিলি রে হারামজাদা,—রাখ্ তোব মাযেব জন্যে বাখ্ দুটো,—কই দেখি।” বলিয়া ঠোঙ্গা হইতে একটি বেগুনি তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে গণেশ পাঁড়ে বাড়ীব দিকে বওনা হইল।

বলরাম মিস্ত্রি এইবাব ভালো করিয়া চাপিয়া বসিল। কাশী হাজরার তামাক খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। কলিকাটির জন্য হাত বাড়াইয়া মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা হাজবা ঠাকুর, যুদ্ধু-যুদ্ধু তো খুব শুনছি আজকাল, কিন্তু যুদ্ধুটা ঠিক কোন্‌খানে হচ্ছে?”

ইউরোপে তখন যুদ্ধ বাধিয়াছে। বিংশ-শতাব্দীব মহাযুদ্ধ।

হাজরা ঠাকুর হুঁকায় শেষ-টান টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবে কহিল, “বিলেত,—বিলেত।”

বেচু আবার তাহার বেগুনি ভাজার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা হাজরা-মহাশয়, বোয়েছেন কিনা, বিলেতটা

আমাদের এই দেশের কোন্‌বাগে ?"

কাশী হাজরা হুঁকা হইতে গরম কলিকাটা ধীরে-ধীরে বলরাম মিস্ত্রির হাতের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"পূব—ঠিক একেবারে খারা পূব্।"—তারপর একটুখানি থামিয়া বলিল, "সেদিন সেই আদালতে গেছলাম। ফিরতে রাত হল। উড়ো-জাহাদ্ দেখে এলাম সেদিন।" মিস্ত্রি কলিকা টানিতে টানিতে বলিয়া উঠিল, "সে আবাব কী-রকম আজ্ঞে ?"

সুমুখেব মাঠে বেচুব গরুর গাড়ীটা পড়িয়া ছিল, হাজরা বলিল, "ওই গাড়ীটার তে-ডব্বল হবে, জন পঁচিশ-ত্রিশেক লোক অনায়াসে চড়তে পারে। তারপর পাঁ—ই করে আকাশে উড়ে চলে যায়। ডাঙ্গায পড়লেই হাওযা-গাড়ী, আবার জলে পড়লেই জাহাদ্।"

"তাহলে তো সে এক তাজ্জব ব্যাপাব বোযেছো কি-না !"

কড়াই-এর বেগুনিগুলা পুড়িয়া যাইতেছিল, বেচু তাড়াতাড়ি সেগুলিকে কড়াই হইতে নামাইযা বলবাম মিস্ত্রীর মুখের পানে তাকাইযা বলিল, "ঠুক্-ঠাক্ করে শুধু কাঠেব গাড়ী তৈরী কবা নয় মিস্ত্রি, বোয়েছ কিনা, এমনি এক-আধটা—"

কাশী হাজরা গম্ভীবভাবে কহিল, "আজ তোমাদের দেখাব। বোজ ওঠে।"

সেদিন বাত্রে আকাশের সন্ধ্যা-তারাটিকে কেহ আর তারাই বলিল না......

কাশী হাজরা বুঝাইয়া দিল, "অনেক দূরে রযেছে বলে আমরা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না, কিন্তু ওটা চলছে,—ঘণ্টায় তিন-চার কোশ তো খুব।"

বলরাম মিস্ত্রি তাহার কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উর্ধ্বে আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "হুঁ, নড়ছে।

দেখ তোমরা বাঁ-চোখটা বুজে,—এইদিকে একটুখানি কাত হয়ে—।"

অনেকেই দেখিল।

সেইদিন হইতে বেচারাম ময়রা কিছু কিছু বুঝিতেছিল—মনে হইতেছিল যেন তাহার চোখ ফুটিয়াছে।

মাঝে মাঝে সে তাহার স্ত্রীকে উঠানের উপর টানিয়া আনে। মাথাটা উপরেব দিকে উঁচু করিয়া তুলিযা ধরিযা বলে,—"উ—ই দেখ্—"

স্ত্রী বলে, "দেখলাম।"

বেচারাম বলে, "আব এই দেখ্, বোঝাছিস্-কিনা, এই কদম-গাছটার দিকে তাকা, এই দিকটা পূব-দিক, এই দিকে সূয্যি ওঠে;—আব ও-ই যে দেখছিস্ অনেকগুলো গাছ, ওব ও-পারেই তোব ডাবির শ্বশুরঘর,—তাব ওপাবে, তাব ও-পাবে, অনে—ক দূর—সেইখানে বিলেত—।"

আরও বুঝাইবাব চেষ্টা কবে। —পৃথিবীটা অনেক বড। ····· ·এবং সেখানে বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহও হয়।

ডিমওয়ালা তাহার মাথাব ঝুড়িটি নামাইযা গণেশ পাঁড়ের দবজায় বসিয়াছিল।

এবং সেই দরজা হইতে একটুখানি দূবে প্রকাণ্ড একটা ফণী-মনসাব ঝোপেব পাশে গণেশ পাঁডের বড ছেলে চৈতন পাঁড়ে দাঁড়াইয়া আছে। যমের অরুচি চেহারা, অত্যন্ত কালো—কদাকার। তাহার মাঠ হইতে চুরি করিয়া এক বোঝা আধ-পাকা ধান কাটিয়া আনিয়া দরজার উপর অপরিচিত ওই লোকটাব ভয়ে বোঝাটা লইয়া সে পার হইতে পারিতেছিল না।

গণেশ পাঁড়ের নজব সর্বপ্রথমে সেইদিকেই পড়িল।

"পেরিয়ে আয় বেটা, পেরিয়ে আয়। আমার ছেলেরে তুই—আমার

বেটা।"

সাহস পাইয়া বোঝাটা মাথায় তুলিয়া চৈতন ঘরে ঢুকিল।

"বাহা রে বাহা রে বেটা জোয়ান! কার মাঠের?"

ঘরের উঠান হইতে চৈতন বলিল, "বাবুদের।"

গণেশ তাহার বাঁ-পাশের গোঁফের ডগাটা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "হুঁ। প্রথমে জমিদার। রুই-কাতলা আগে,—তারপর চুনোপুঁটি।"

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া সে ডিম-ওয়ালার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কি রে—কি বটেরে তোর?"

ডিমওয়ালা অনেক কষ্টে কাঁদিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "হুজুর—"

"বুঝেছি, বুঝেছি,—কত নিয়েছে বল্?"

"আজ্ঞে আনা চারেক।"

"ধেৎ বেটা পাজি!"

ডিমওয়ালা চমকিয়া উঠিল।

"আনা-চারেক কিরে বেটা,—আনা-চারেক কি? টাকা-চারেক বল্। তার কম মামলা চলে না। দাগ-রাজি? গায়ে দাগ হয়েছে তো? মারের দাগ?"

"আজ্ঞে না। মিছা কথা বলব কেন, সে সব কিছু—"

ঘরের উঠানে খেজুরের একটা ছড়ি পড়িয়াছিল, গণেশ পাঁড়ে তাড়াতাড়ি সেইটা কুড়াইয়া আনিয়া সপ্ সপ্ করিয়া উপরি-উপরি দু-তিন ছড়ি লোকটার পিঠের উপর বসাইয়া দিল। যন্ত্রণায় লোকটা চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। "আর এ-গাঁয়ে আসব না বাবু—"

"চোপ্ চোপ্, শালা চোপ্! আস্‌বি না,—আস্‌বি না কি? খুব

আস্‌বি।" বলিয়া পাঁড়ে তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "ঠিক, এই ঠিক দাগ হয়েছে—রক্তমুখী দাগ। বলবি, মেরেছে, উল্টে চারটি টাকাও কেড়ে নিয়েছে। আচ্ছা, এইবার খরচ কত করতে পারবি বল্‌?"

লোকটা একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "খরচ আজ্ঞে ক্যাম্‌নে করি—গরীব লোক, ডিম বেচে খাই।"

ঘাড় নাড়িয়া পাঁড়ে বলিল, "উঁহু। দশ টাকা আমাব, যাতায়াত খরচা বাদে। আর সাক্ষীর জন্য,—আচ্ছা ওই দশ টাকা।"

ডিমওয়ালা পাঁড়ের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"আজ্ঞে হুজুর! খবচ আমি কিছুই কবতে পারব না।"

পা দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া পাঁড়ে বলিল, "তবে দুব হ, দূর হ! যাঃ! কপালে তোর মাব ছিল—খেয়ে গেলি, বাস্‌। টাকা না হলে যখন মামলা হয় না। আচ্ছা, কষ্ট করে যখন এসেছিস ওরে ও চৎনা, ও চৈতন! কাগজ-পেন্সিল আন্‌ দেখি, একটা কাগজ-পেন্সিল।"

চৈতন কাগজ-পেন্সিল আনিয়া দিল। কাগজটা দরজাব কপাটের উপর চাপিয়া ধবিয়া তাহাব উপর ভোঁতা একটা পেন্সিল দিয়া চর্‌ চর্‌ করিয়া মিনিট কয়েকের মধ্যেই গণেশ ইংবাজিতে কয়েকটা নাম লিখিযা ফেলিল।

তাহার পর কাগজটা সুমুখে ধরিয়া বলিল, "এই সব নাম লিখে দিলাম। ইংরাজিতেই লিখলাম।

কেনারাম মুকুর্জি—
রাখহরি পাটেক্—
পানকিষ্ট গ্যাঙ্গুলী—

গভাঢের চাটুর্জি—

হরেকিষ্টো টাঁটি—

আর ঘটনাস্থল—পেলেস অভ্ অকুরেন্স হচ্ছে—সজনী ময়রার দোকান। ধর্—হাত পাত—এই চির্কুট্ ধর্।”

কাগজের টুক্‌রাটি ডিমওযালা হাত পাতিযা গ্রহণ করিল।

“বাস্! সোজা চলে যা ইস্টিশান। সাম্‌নেই থানা। ইন্‌স্পেক্টরবাবুর কাছে দে ঠুকে—এক নম্বর ডাইরি। এই এই লোকের নাম। বল্‌বি, হুজুর, মেবে-ধরে চারটি টাকা কেড়ে নিলে। মাবের দাগ দেখাবি। রক্তমুখী দাগ।”

গণেশ পাঁড়ের দাঁতগুলা হঠাৎ এত জোবে কড়্মড্ করিযা উঠিল যে ঠিক মনে হইল যেন ছোলাভাজা চিবাইতেছে। বলিল:

“হায় বে টাকা! টাকা যদি খরচ করতে পাবতিস্ হতভাগা, তো দেখিয়ে দিতাম ঐ শালা কেনা, আব ঐ শালা—। বলবি, সাক্ষী অনেক আছে হুজুর, সবাইকে চিনি না। আমারও নাম করতে পারিস্—গানেশিলাল পাণ্ডে। জি, এল্, পাণ্ডে বললেও হয়—জি-এল্ পাণ্ডে!”

ডিমওয়ালা বিদেশী মানুষ। ভাই তাহাব স্টেশনেব এক গার্ড-সাহেবের বাবুর্চি এবং খানসামা দুই-ই। স্টেশনটি জংসন হইয়াছে। অনেকগুলি সাহেব-সুবার বাস। মুরগীর ডিমের ব্যবসাটা এখানে ভালো চলিবে ভাবিয়া জসিডিব ‘সিগ্‌ন্যাল্-ম্যানের’ কাজে জবাব দিয়া সে এখানে আসিয়াছে। কিন্তু যাহার খাতিবে সে তাহার অমন সাধের ‘নোক্‌রি’ ছাড়িয়া দিল, এখানে বুঝি সে খাতির আব টেঁকে না। এই ভাবিয়া সে তাহার ডিমের ঝুড়িটি পুনবায মাথায় লইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্নমনে স্টেশনের দিকেই চলিয়া যাইতেছিল।

পশ্চাৎ হইতে গনেশ পাঁড়ে আবার হাঁকিল “শোন্!”

ডিমওয়ালা ফিরিয়া দাঁড়াইতেই পাঁড়ে ঠাকুর নিজেই একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, "থানা চিনিস্? থানা? না চিনিস যদি তো এক কাজ কর্। বরাবর সটান্ চলে যা লাইনের ধারে। বাঁ-দিকে বড় ফটক্। সেইখানে যাকে শুধোবি, সেই-ই বলে দেবে—কিশোরী পাঁড়েকে সবাই চেনে—হেড্ চাপ্‌রাশী,—আমার ছোট ভাই; ফটকে কাজ করে। ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান্—ভুঁটিয়াল চেহারা; কাঁধে দেখবি মস্ত একটা চোটের দাগ। তাকে আমার ওই কাগজ দেখাবি, বল্‌বি,—থানার কাজ, আপনার দাদা পাঠালেন। ইংরেজিতে লেখা,—বল্‌বি, কাউকে দিয়ে যেন পড়িয়ে নেয়। বুঝ্‌লি?"

"যে-আজ্ঞে হুজুর।" বলিয়া ডিমওয়ালা চলিয়া গেল।

পাশেই কামার-পাড়া। পূর্বে নাকি বস্তিটা মন্দ ছিল না। এখন কতক মরিয়া-ঝরিয়া গেছে, কতক-বা অন্যত্রে বাস করিতেছে। অবশিষ্ট যে-কয়জন আছে তাহারাই কোন রকমে অত্যন্ত হীন অবস্থায় দিন যাপন করে। রাস্তার ধারে একটি ঘরে এখনও কোন রকমে একটি 'হাপর্' মাঝে-মাঝে ফুঁস্-ফুঁস্ করিয়া চলে, লোহা-পিটানোর ঠুং-ঠাং শব্দ হয়,—এবং সেই শালঘরের অর্ধেকটায় হরিপদ কামারের গরু বাঁধা থাকে। ফাল, লাঙ্গল কোদাল, কাস্তে, কুড়ুল, বঁটি—চাষ-বাসের যাবতীয় লোহার সরঞ্জাম হাতের কাছে সবই বাজারে কিনিতে মিলে, কাজেই হরিপদর কাজ-কর্ম এক প্রকার থাকে না বলিলেই হয়,—তবে এই শীতের প্রথমটায় সব কাজ ফেলিয়া তাহার একবার হাপর-হাতুড়ি না ধরিলেই চলে না। অগ্রহায়ণে ধান পাকিবে,—পুরানো কাস্তেগুলা একবার শানানো দরকার।

তাই অনেকেই সেদিন তাহার শালে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

গণেশ পাঁড়ের হাঁক-ডাক শুনিয়া হরিপদর কামারশালের ভাঙা দরজা

হইতে কয়েকজন লোক উঁকি-ঝুকি মারিতেছিল, বিষণ দে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম তাহার উপব নজর পড়িতেই পাঁড়ে বলিয়া উঠিল, "ওহে বিষণ, শোন, শোন,—তোমার ছেলেটা সেদিন গাঁজা টানছিল হবেকেষ্টা তাঁতিব সঙ্গে, ভাগ্যে আজ সে ছিল না, তা নইলে এই সঙ্গে ওকেও দিতাম গেঁথে। যাক্, বেটা খুব বেঁচে গেল! তোমাব খাতিব-টাতির আর থাকবে না বাপু, তাও বলে বাখছি। লাট্-সায়েবের খাতির নাই আমাব কাছে। আমবা জাত কমুজ্যে—আমাদের রাগ ভাবি খারাপ।" এই বলিয়া সে পিছন ফিরিযা চলিযা আসিতেছিল, কিন্তু ব্যাপারটা ভালো বুঝিতে না পারিযা বিষণ তাহাব পিছন ধরিল। বলিল, "বুঝ্‌তে পাবলাম না পাঁড়ে ঠাকুব, কি বলছ আপনি?"

গণেশ কিন্তু তাহাকে বুঝাইবাব চেষ্টা করিল না। আপন-মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, "সব শালাই সমান, হবেকেষ্টা, রেখো, পেনো, আর ওই কেনা-শালা, ওই যে চোখ মিটির-মিটির্! শালা ভাবি বজ্জাত! সেদিন বলে কিনা, আমাব গরুতে ওর ধান খেয়েছে। হাঁ, খেয়েছেই তো! আচ্ছা করেছে। আর মাববি শালা ডিমওয়ালাকে,—মাববি আর কখনও?" বলিতে বলিতে ঘবে ঢুকিযা বিষণ দের মুখেব উপরেই গণেশ পাঁড়ে সদর দবজাটা হড়াম কবিয়া বন্ধ কবিয়া দিল।

কিন্তু বিষণ দে ইহাব মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে না পাবিয়া একেবারে অকুল পাথাবে পড়িয়া গেল। ছেলেটা না হয় গাঁজাই খায়, কিন্তু পাঁড়ে ঠাকুবের কোপ দৃষ্টিতে পড়িল কেমন করিয়া?

হাপব-টানা কাঠের মাথায় লোহার একটা শিক্‌লি ঝুলিত, কিন্তু তাহার অর্ধেকটা হরিপদর বাপের আমলেই ছিঁড়িয়া গেছে। সেই অবধি শিক্‌লির বাকি অর্ধেকটায় কাতার দড়ি দিয়া বাঁধিয়াই কাজ চলিত,—

আজ আবার টানিতে টানিতে সেটুকুও ছিঁড়িয়া গেল।

শিকলির ডগায় হরিপদ কাপড়ের একটা ছেঁড়া পাড় দু-ফেরতা করিয়া বাঁধিতেছিল।

বিষণ দে তাহার কাস্তেটি লইবার জন্য পুনরায় কামারশালে ফিরিয়া আসিল।

শালের ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া ভূষণ নন্দী তখনও উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। বিষণ ফিরিয়া আসিবামাত্র প্রথমেই সে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কী বলে? বেটা পাঁড়ে কী বলছে—কী?"

পাঁড়ের ওই চৈতন বংশধরটির কৃপায় গত বৎসর পুবা একটি বিঘা জমির পাকা ধান ভূষণ তাহাব ঘবে আনিতে পায় নাই, কাজেই গণেশ পাঁড়ের উপর তাহার আক্রোশ একটুখানি বেশি হইবারই কথা।

বিষণ বলিল, "কি যে বললে, আর কি যে কবলে, তা ঐ ঠাকুরই জানে রে ভাই—মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।"

হাপরের দড়িটি বাঁধিতে বাঁধিতে হরিপদ কামার তাহাদেব বুঝাইয়া দিল, "পাশাপাশি ঘব বাবা, কুমীরের সঙ্গে জলে বাস, আমাদের সব দিকেই নজর রাখতে হয়। তোমাদের ফালও শানাই, আবার ও-বেটার দিকেও—।"

এই বলিয়া ভণিতা করিযা সে যাহা বলিল তাহাব সারমর্ম এই যে, ও-বেটা প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমনি ফড়র্‌ ফড়র্‌ করে, উহাব কথায় কান দিতে গেলে চলে না। কেনারাম মুখুজ্যে, হরেকিষ্টো, রাখহবি এবং আরও কয়েকজন মিলিয়া আজ সকালে এক ডিমওয়ালাকে মার-ধোর করিয়া কয়েকটা টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। গণেশ পাঁড়ে সেই ডিমওয়ালাকে উহাদের নামে নালিশ করিতে পাঠাইল। বিষণ দের ছেলে সেখানে ছিল না,

থাকিলে তাহাকেও ঐ সঙ্গে আসামী করিয়া গাঁথিয়া দিত। ইত্যাদি।

একটুখানি থামিয়াই হরিপদ পুনরায় কহিল, "মিছে কথা বলব কেন নন্দী,—চিট্ আমার একটুখানি ছিল ওর সঙ্গে। এক পাড়ায় বাস, গুঁতোর চোটে বাবা বলতে হত! কি জানি বেটা ঘরে আগুন-টাগুনও তো ধরিয়ে দিতে পারে!"

ভূষণ নন্দী বলিয়া উঠিল, "খুব পারে—খুব পারে, বেটার অসাধ্যি কম্ম নাই।"

হরিপদ বলিল, "চাষের সময় লাঙ্গলেব ফাল্ শানানোর জন্যে এক শলি করে ধান তো আমরা সব ঘরেই পাব—সে তো তোমরা সবাই জান। কিন্তু ও আমাকে কোনদিন এক-চোঁচাও ঠেকায় না। সেদিন বললাম তো বলে কিনা, ঘরেব দুয়োরে বাস করে রয়েছিস্ শালা কামার, ধান কিসেব, পাযেব চারটে ধুলো নিয়ে যা।"

বিষণ দে এতক্ষণ ধবিযা হরিপদ কামারের আগের কথাগুলা মনে মনে ইস্তাম্ করিতেছিল। এইবার সে তাহার কাস্তেটি হাতে লইয়া উঠিল

হবিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "উঠলে যে?"

বিষণের মুখখানা আগের চেয়ে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল। বুড়ার বয়স হইয়াছে। চোখেব উপব ভুরুব চুলগুলা খুব বড বড়, কতক পাকিয়াছে, কতক-বা কালো। সেই ভুরু কুঁচকাইয়া বিষণ বলিল, "উঠ্লাম। হুঁ।"

বলিয়াই সে আবাব বসিল। এবং এইবাব সে হরিপদর খুব কাছে সরিয়া আসিয়া পেশীবহুল তাহার মোটা-মোটা হাড়ের বহু পুরাতন হাতখানি হরিপদর হাঁটুর উপর রাখিয়া ধীরে-ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "তোমার কথাগুলি সব ঠিক, কিন্তু—তুমি জান না হরিপদ, ছেলেটা আমার বুঝলে কিনা—ভারি বদ্।"

ভূষণ নন্দী বলিল, "গাঁজাও খায়।"

"আ হা হা হা সে তো—" বলিয়া বিষণ তাহার হাতখানি হরিপদর হাঁটু হইতে তুলিয়া ভূষণের দিকে ফিরাইষা বলিল, "সে তো খায়-ই। সে তুমিও জান—আমিও জানি।"

ঘাড় নাড়িয়া নন্দী কহিল, "হাঁ, আমিও তো তাই বলছি—খায় তো খায়—আপনার নিজের পয়সাতেই খায়, তা তোর বাপেব কি রে শালা!" বলিয়া সে তাহার কাস্তে সমেত হাতখানা সেইখান হইতেই গণেশ পাঁড়ের ঘাড়ের দিকে বাড়াইয়া দিল।

বিষণ বলিল, "না না, তা বল না নন্দী। বাম্ভূণ,—সে যতই হোক্—দেব্‌তা। তাব উপবে বয়সে বড। তা খাবি তো খা, পাঁডেব চোখের সামনে খাওয়ার তোর কাজ কি? আপনাব ঘবে বসে খা—লুকিয়ে-চুবিয়ে খা। আর—" বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া আবাব আরম্ভ কবিল, "তোর ঘর বইল কোথা, আব তুই 'নিশা' করতে গেলি কোথা—হোই পুব্‌-পাড়ায় হবেকিষ্টো তাঁতির সঙ্গে। আবার শুন্‌ছি, আমার সাত পুরুষে যা কখনও কোথাও নাই—আমার ছেলেটির—"—বলিয়া বিষণ তাহার শূন্য হস্তে একটি গেলাসেব কল্পনা কবিয়া হাতটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ঢুকু-ঢুকুও চলছে নাকি আজকাল—।"

"যাই, দেখি আবাব! হরেকিষ্টোর কাছে যাই। কাল আসব, বুঝলে হরিপদ? কাস্তেটা থাক।"

হাতের কাস্তেটি হরিপদব কাছে নামাইয়া দিয়া বিষণ দে উঠিল। কিন্তু ভাঙা দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল। বলিল, "যখন্ বলছে যাত্তার দল করব! তা করুক্। নিশা-ভাঙ খেয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ভালো। এক-আধ শলি চাল-ধান লাগে, তা আমি বলেছি—লাগুক, দেব। আর এই

গাঁজা, গুলি, আফিং,—এর রেয়াজ্‌ট আজকাল সব-গাঁয়েই। বুঝেছ? কলিকাল আর কাকে বলেছে তবে? সেদিন—অনন্ত নায়েকের সেই গুড্ডিম্‌ ছেলেটা—দেখি, সেদিন সেও ওই একটা কল্‌কে নিয়ে সটান টানছে। উচ্ছন্ন গেল—সব গেল।"

বলিতে বলিতে বিষণ দে এবার সত্য-সত্যই রাস্তায় গিয়া নামিল।

হরেকৃষ্ণর এক ঘর। তাঁকি অনেক আছে, কিন্তু হরেকৃষ্ণর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন বলিতে কেহ কোথাও নাই। প্রকাণ্ড একটা বস্তির ধ্বংসাবশেষের একটেবে তাহাব মাত্র একখানি ঘব কোনরকমে টিঁকিযা আছে। ঘবখানির মাঝে একটা দেওয়াল। এক প্রস্থে নিজে রাঁধে বাড়ে থাকে, আব এক প্রস্থে তাঁত-ঘব। কিন্তু তাঁতটি গত বৎসরের এক দুর্দিনে সে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে। দিন যে এখন তাহার কেমন করিয়া চলে তাহা সে-ই জানে। তাঁতঘবেব গর্তটি এখনও বন্ধ করা হয নাই। সেই গর্তের আশে-পাশে বসিয়া কয়েকজন ছোকরা সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা মারে, গল্প করে, তামাক ওড়ায়। হরেকৃষ্ণ ও রাখহরি দুজনে তখন পাঁশাপাশি সেইখানে বসিয়া চুপি-চুপি কি যেন পরামর্শ কবিতেছিল।

বিষণ দে দবজা হইতে ডাকিল, "হরেকিষ্ট!"

হরেকৃষ্ণ বাহিবে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেমন করিয়া কথাটা বলিবে বিষণ দে বুঝিতে পারিতেছিল না, কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কি রকম যে শুনছি—"

"কী রকম?"

দে বলিল, "কে নাকি নালিশ করতে গেল তোমাদের নামে?"

"হুঁ, তাই শুনছি। ও কিছু না। সেই ডিমওয়ালা তো?"

রাধহরি ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "ডিমওযালা আবার কে? ডিম্-টিম্ জানি না আমরা কিছু, যাও বাপু যাও, তুমি ঘরে যাও।" বলিয়া সে বিষণের হাত ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল।

হরেকৃষ্ণও এইবার সেই কথায় সায় দিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা বই কি! কে কাকে মেরেছে, কে কার টাকা কেড়ে নিয়েছে, তা আমরা কি জানি? অমনি মিছামিছি যার-তার একটা নাম করে দিলেই হল কি না?"

বিষণ ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আমাদের মথন্ তখন তোমাদের সঙ্গে—" কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

রাধহরি বলিল, "তাই বল যে নিজের ছেলেটিব খোঁজ নিতে এয়েছ। না যাও, তোমাব মথন্ ছিল না। মথন্ তোমাব লক্ষী ছেলে।"

"তাই এসেছিলাম বাবা, সেই কথাটিই জানতে এসেছিলাম।" বলিয়াই বিষণ পিছন ফিবিল।

বাড়ি ফিবিতেই দেখিল তাহাব একমাত্র পুত্র মন্মথ ইহাবই মধ্যে স্নান করিয়াছে এবং মাথায বেশ একটি লম্বা টেরি কাটিয়া নীলরঙের ডোরাকাটা ফতুযাটি গায়ে দিয়া উঠানেব উপর বসিয়া একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়া তাহার চটি জুতা জোড়াটি পরিষ্কার করিতেছে।

বিষণ তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল, "হাঁ বাবা মথন্, সত্যি করে বল্ দেখি বাবা, পাঁড়ে মশাযের সাক্ষাতে কোনদিন গাঁজাটাঁজা খেয়েছিলি?"

"কে, আমি?" বলিয়া মথন্ তাহার বৃদ্ধ পিতার মুখের পানে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নাঃ।"

বিষণ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ্

সত্যি করে বল্ বাবা—"

"নাঃ! মাইরি—না। তোমার দিব্যি করে—এই ভগবতীর চামড়া ছুঁয়ে বল্‌ছি—তা কেন খেতে যাব?" এই বলিয়া মন্মথ তাহার জুতা জোড়াটি স্পর্শ কবিযা শপথ করিল।

এত বড় শপথেব উপব আব কথা চলিল না। বুড়া বাপ. চুপ কবিযা রহিল।

বেলা তখন প্রায দু-পহব গড়াইযা গেছে।

হৈমন্তিক ধান পাকিবাব সময। গ্রামের পথেব উপর, পাকা ধানেব বোঝাই-গাড়িগুলা তখন হামেসাই যাওযা-আসা করে। পথের ধূলাও উড়ে, শব্দও হয়,—দুপুব নিস্তব্ধ প্রায়ই থাকে না।

কিন্তু সেদিন ঠিক এমনি সমযটায গ্রামেব মধ্যে সে এক ভযানক গোলমাল উঠিল। গাড়ীব গোলমাল নয—মানুষে-মানুষে মারামারি-খুনাখুনি গালি-গালাজের বিশ্রী কোলাহল। মনে হইল, শব্দটা যেন দেখিতে দেখিতে পাঁড়ে-পাড়া হইতে ধবমতলা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

দূব হইতে ভালো বুঝাও যায না, অথচ,-পাঁড়ে-পাড়াব গোলমাল। ঘটনাস্থল পর্যন্ত আগাইযা যে কেহ দেখিযা আসিবে—এত বড সাহস কাহাবও নাই। যাহাদেব আছে, কেহ-বা পড়ো-বাড়িব ভাঙা দেওযালের ফাঁকে-ফাঁকে, কেহ-বা গাছেব আড়ালে, কেহ-বা পুকুবেব পাড দিযা খানিকটা আগাইযা গেল; এবং অনেকেই আপন-আপন দবজায় দাঁড়াইযা মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবিতে লাগিল।

এমন গোলমাল এ-গাঁযের লোক অনেক শুনিযাছে।

গণেশ পাঁড়ে বলে, বাংলায তাহাদেব চৌদ্দ পুরুষ বাস করিতেছে

সত্য, কিন্তু তাহারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ বাঙ্গালী নয়, কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছে,—তাহারা কন্নৌজ্। মারামারি-কাটাকাটি তাহাদের রক্তের মধ্যে।

এবং পূর্বপুরুষের সে গৌরবান্বিত রক্তের পরিচয় তাহারা দিতে ছাড়ে না।

গণেশ পাঁড়েব বাপেব আমলে তাহাদেব খুড়ায়-জ্যেঠায়, আত্মীয় কুটুম্বে প্রায় আট-দশ ঘব পাঁড়ের বাস ছিল এই গ্রামে। ঝগড়া বিবাদের সময় লাঠিতে-হাতিয়াবে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা এক সঙ্গে হইয়া পড়িত।

গ্রাম হইতে প্রায় মাইল-খানেক দূবে, সরকারি একটা রাস্তার উপর, ছোট একটি নদী বাঁধা পড়িয়াছে। নদীব সেই রেলিং-দেওয়া লোহাব সাঁকোটিকে মাঝে বাখিযা, বাস্তাব দু-ধারে বহু পুরাতন প্রকাণ্ড গাছের শ্রেণী শাখায-পাতায পবস্পরকে জড়াজড়ি কবিয়া এমনি ঘন বিন্যস্ত হইয়া বহু দূব পর্যন্ত সোজা চলিযা গেছে যে, দিনের বেলা রাস্তাটা মনে হয় অন্ধকার,—একা চলিতে গা ছম্-ছম্ কবে। জায়গাটাব নাম ভালুকমাবাব পুল। এই পুলের কাছাকাছি জংশন-স্টেশনেব একটি বেলের লাইন পাব হইযাছে,—সেই লাইনেব ফটকওয়ালা ছিল গণেশ পাঁড়েব পিতামহ। গ্রাম হইতে বুড়াকে রোজ সেইখানে যাওয়া-আসা করিতে হইত। অন্ধকার রাত্রে পথযাত্রী অনেক পথিক সেখানে মাবা পড়িয়াছে,—এবং এ-সব ছিল নাকি তাহারই কাজ।

গণেশের এক কাকা নাকি ঢিল ছুঁড়িয়া পাখী মারিত। ঢিলের সন্ধান তাহার অব্যর্থ ছিল।

রজনী পাঁড়ের গায়ে চোট বসিত না।

এ-সব কাহিনী গ্রামের লোক এখনও ভুলে নাই।

মারামারি খাওয়া-খাওয়ি তাহারা চিরকালই করে। কিন্তু সে বৎসর মাত্রাটা যেন একটুখানি বেশিই হইয়া পড়িল।

সেও আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর পূর্ব্বে কথা।

পাঁড়েদেব সকলের ঘরেই তখন অনেকগুলা করিয়া পায়রা থাকিত। গণেশ ও কিশোবী পাঁডেব ঘরে চাল-ধানের চিরকাল অভাব। অথচ, সুখের পায়বা,—যেখানে খাইতে পায় সেইখানেই চলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে গণেশ পাঁডের পায়রাব 'টোং' ফাঁক হইয়া গেল। সে ভাবিল, লোকে বুঝি তাহাব পায়রাগুলি মারিয়া মাবিয়া খায়।

এই লইয়া তাহাদের ঘবে-ঘরে একটা ঝগড়া বাধে। গণেশ ও কিশোরী একদিকে,—অন্যান্য পাচ-ছ ঘব পাঁডে আর-একদিকে, মুখে-মুখে চলিতে চলিতে হাতাহাতি শুরু হয। তাহার পর, মাস পাঁচ-ছয ধরিয়া প্রত্যহই তাহাদেব এমনি একটা-না-একটা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ চলিতে থাকে। উভয পক্ষই লাঠি-সোঁটা, বঁটি-কুড়ুল লইযা বাহিব হইয়া আসে, দূরে দাঁড়াইযা গালি-গালাজ করে, ঢিল ছুঁড়ে দু-একটা মারপিট হয়,—আবার সব আপন-আপন ঘবে গিয়া চুপ করিয়া বসে। এমনই চলিতেছিল।

হঠাৎ সে-বছব গ্রীষ্মকালের চমৎকার একটি প্রভাত বেলায় মানুষ তাহাব চরম সীমায় গিযা পৌঁছিল।

নবোদ্ভাসিত অরুণের স্নিগ্ধ আলোক তখন সবেমাত্র পডো-বাড়ির আগাছার জঙ্গলে,—তাল-তেঁতুলের মাথার উপরে ঝিকিমিকি করিতেছে। আকাশ তেমনি নীল, বাতাস তেমনি স্বচ্ছ···কিন্তু ধরার ধূলা মানুষের রক্তে সেদিন রাঙা হইয়া উঠিল।

অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উভয় পক্ষই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গণেশ পাঁড়ে কোথা হইতে একটা বহুকালের পুরাতন মুঙ্গেরি গাদা-বন্দুক জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। জনতার মধ্যে তাহাই সে সেদিন মরি-বাঁচি করিয়া চালাইয়া দিল।

সীসার ছররায় মানুষ মরিল না। জন পাঁচ-ছয় জখম হইয়া গেল। যাহারা হইল না, তাহাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া কিশোরী পাঁড়ের হাতের উপর একটা ভোঁতা কুড়ুলের চোট বসাইয়া দিল। কিশোরীর লাঠিতে একটা লোকের মাথা ফাটিল। এমনি করিয়া সেদিন একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেদিন আর ইহার মীমাংসা ঘরে বসিয়া হইল না।

সরকারি আদালতে ফৌজদারি নালিশ রুজু হইল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বিচার চলিতে লাগিল। আসামী সাক্ষীর এজাহার আর শেষ হয় না। সাহেব হাকিমের মাথার ভিতরটা গোলমাল হইয়া গেল। অবশেষে বছর-দেড়েক ধরিয়া এই এত-গুলি লোকের হয়রানির পর বিচার শেষ হইল।

এক পক্ষের যৎসামান্য দণ্ড হইল। গণেশ পাঁড়ে দিন পাঁচ-ছয় জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিল। অপর পক্ষ মার খাইয়া বিচার কিনিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া, খালাস পাইল।

তাহার পর মোটে ছয়টি বৎসর পার হইয়াছে।

এবং এই ছয় বৎসরের মধ্যে গণেশ-কিশোরী ছাড়া অন্যান্য যে কয় ঘর কনৌজ ব্রাহ্মণের বাস এ গ্রামে ছিল সকলেই প্রায় নির্বংশ হইয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র কয়েকজন বিধবা। একজন গোপনে গাঁজা-বিক্রির ব্যবসা চালায়। পেটের দায়ে একজন শহরে গিয়াছিল,—কোন্ এক মাড়োয়ারীর জাঁতাকলে

গম পেশার কাজ করিত, এখন সে কি একটা হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। একটি ঘরে দু-জন ছোকরা আছে। একজনকে তো যুবক বলিয়া মনেই হয না। আর-একজনেব দিনে দুই বার করিয়া জ্বব আসে, অনবরত তাহাকে লেপ-কাঁথা মুডি দিয়া ঘরেব এক পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায। আব একটি ঘর ছিল—গণেশ পাঁড়ের ঘবেব প্রায কাছাকাছি। তাহাদেব শেষ বংশধব মতিলাল বহু দিন হইতে কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগিতেছিল। গত বৎসব এমনি দিনে পাল্‌শিটেব মিশনাবী কুষ্ঠাশ্রম হইতে লোক আসিযা জোব-জববদস্তি কবিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে সেইখানেই লইয়া গেছে।

তাহাবই সেই ফাঁকা-বাড়িব ভাঙা প্রাচীব ডিঙাইযা, গ্রামেব কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক আজিকাব সেই পাঁড়ে-পাড়াব গোলমালের রহস্যটা জানিবাব জন্য দরজার আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি মাবিতে লাগিল।

গণেশ পাঁড়ে সপরিবাবে দবজায আসিযা দাঁড়াইযাছিল।

"ইস্টিশানের ঘাঁটি আগ্‌লে তুই বসে থাক বেটা চৈতন,—বেটাবা পেবোবে আব খবব দিবি। তাবপব আমি দেখে নেব।"

এই বলিয়া গণেশ তাহাব লোহা-বাঁধানো ছোট লাঠিখানি মাটিতে বাব কতক ঠক ঠক কবিয়া এ-হাত ও-হাত কবিতে লাগিল।

গণেশের জামাতা—সুন্দরসিং চৌবে—হিন্দুস্থানী কনৌজ ব্রাহ্মণ। আবা জেলার কোন্ একটা অখ্যাতনামা গ্রামে তাহাব বাড়ি। মজফ্‌ফবপুব না কি এমনি একটা শহবেব এলাকাব অধীনে কোথায় কোন থানায় কনেস্টবলেব কাজ কবে। চৌবে-মহাশয় গণেশেব কন্যাকে সেথানে লইয়া যাইতে চাহিযাছিলেন, কিন্তু সে মেড়ুয়া-খোট্টার দেশে গণেশ তাহাকে পাঠায় নাই,—মেয়েও যাইতে নারাজ

এবং এই কারণে শ্বশুর-জামাতায় কি-একটা মনান্তর হওয়ায় জামাই-বাবাজীর সম্ভবত রাগ হইয়াছে। বৎসারান্তে ছুটি পাইলেই একবার করিয়া অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যও এ-গ্রামে শুভাগমন হইত, কিন্তু গত বছর দুই-তিন তিনি আব আসেন না। স্ত্রী তাঁহাব বিবহে দিন-দিন মোটাসোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

পিতার যদি কোন সাহায্যে লাগে ভাবিয়া গণেশের সেই কন্যাটিও দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিল:

"থাক্‌তো আমার জামাই—সুন্দর! দেখাতো মজা! দু-চারটে মাথা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যেতো।"

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর নামে বিবহিনী ভার্যাব মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু এই বিপদের দিনে হাসিতে নাই, কাজেই সে তাহার হাসির অর্থটা একটুখানি বদ্‌লাইযা দিবার নিমিত্ত কাকা-কিশোবীলালের দিকে তাকাইয়া পুনরায হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখ মা দেখ্‌, কাকা কেমন—"

কিশোবীলাল তখন স্টেশনেব ফটকেব কাজে ভাত খাইবাব ছুটি পাইযা বাড়ি আসিযাছে। ব্যাপাব দেখিযা এক হাতে একটা টাঙ্গি ও এক হাতে একটা কুড়ুল লইযা ভ্রাতাব সাহায্যার্থে সেও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতিরিক্ত রাগিলে কিশোরীলাল বীরের মত আস্ফালন করিয়া খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতে থাকে,—মুখ দিয়া তাহার একটিও কথা বাহির হয় না,—ইহাই তাহার স্বভাব সেদিনও সে তাহাই করিতেছিল।

এমন সময় ধবম্‌তলার দিক হইতে উপর্যুপরি কয়েকটা ঢিল কিশোরীলালেব পায়ের কাছে আসিযা পড়িতেই তাহার আস্ফালন বন্ধ হইয়া গেল।

লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ঢিল আসে।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কিশোরীলাল একটুখানি তফাতে একটা বটগাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

ঢিল দেখিয়া গণেশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"ঢিল ছোঁড়ে লাগাও শালাদের,—মারো মারো শালাদের, ফুটাও খুন্ করে ফেলে দাও। ফাঁসি-শূলি হয়,—আমি দেখে নেব, আমি দেখে নেব, লাগাও—"

বলিতে বলিতে নিজের মেয়ে-ছেলে সামলাইয়া লইয়া গণেশ তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

এদিকে সে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মতিলালের পরিত্যক্ত বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া গ্রামের যে-কয়জন ছোকরা হাঙ্গামা দেখিতেছিল, ঢিল দেখিয়া তাহারাও প্রাণপণে ছুটিয়া আপন-আপন পথ দেখিল।

এবং অনতিবিলম্বেই গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ধরমতলা পূব্-পাড়ার সমস্ত লোকের সঙ্গে পাঁড়েদের দুই ভাইয়ের ঝগড়া বাধিয়াছে, কিন্তু ঝগড়া যে কি লইয়া বাধিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, "আর একটু থাকলেই জানা যেতো।"

"কিন্তু—"

"যে ঢিল্!"

"আর একটুখানি হলেই আমায় মাথায়।"

দৌড়িয়া আসিয়া সকলেই তখন হাঁপাইতেছিল।

"বাপ্‌রে বাপ্! এ—ত বড়-বড় ঢিল্।"

"খুনোখুনি হল বলে! শোনই না!"

অনেকেই সেই দিকে কান পাতিয়া রহিল। গরুর-গাড়ির গাড়োয়ানদের

এবং এই কারণে শ্বশুর-জামাতায় কি-একটা মনান্তর হওয়ায় জামাই-বাবাজীর সম্ভবত রাগ হইয়াছে। বৎসারান্তে ছুটি পাইলেই একবার করিয়া অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যও এ-গ্রামে শুভাগমন হইত, কিন্তু গত বছর দুই-তিন তিনি আব আসেন না। স্ত্রী তাঁহার বিরহে দিন-দিন মোটাসোটা হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

পিতার যদি কোন সাহায্যে লাগে ভাবিযা গণেশের সেই কন্যাটিও দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিল:

"থাক্‌তো আমার জামাই—সুন্দব! দেখাতো মজা! দু-চারটে মাথা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যেতো।"

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর নামে বিবহিনী ভার্যাব মুখে হাসি ফুটিল। কিন্তু এই বিপদের দিনে হাসিতে নাই, কাজেই সে তাহার হাসিব অর্থটা একটুখানি বদ্‌লাইযা দিবার নিমিত্ত কাকা-কিশোবীলালেব দিকে তাকাইয়া পুনরায হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখ মা দেখ্‌, কাকা কেমন—"

কিশোবীলাল তখন স্টেশনেব ফটকেব কাজে ভাত খাইবার ছুটি পাইয়া বাড়ি আসিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া এক হাতে একটা টাঙ্গি ও এক হাতে একটা কুড়ুল লইয়া ভ্রাতাব সাহায্যার্থে সেও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতিবিক্ত বাগিলে কিশোরীলাল বীরের মত আস্ফালন কবিয়া খুব লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করিতে থাকে,—মুখ দিয়া তাহাব একটিও কথা বাহির হয় না,—ইহাই তাহাব স্বভাব সেদিনও সে তাহাই করিতেছিল।

এমন সময় ধরমতলার দিক হইতে উপর্যুপরি কয়েকটা ঢিল কিশোরীলালেব পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই তাহার আস্ফালন বন্ধ হইয়া গেল।

লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ ঢিল আসে।

অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কিশোরীলাল একটুখানি তফাতে একটা বটগাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

ঢিল দেখিয়া গণেশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"ঢিল ছোঁড়ে লাগাও শালাদের,—মারো মারো শালাদের, ফুটাও খুন্ করে ফেলে দাও। ফাঁসি-শূলি হয়,—আমি দেখে নেব, আমি দেখে নেব, লাগাও—"

বলিতে বলিতে নিজের মেয়ে-ছেলে সামলাইয়া লইয়া গণেশ তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

এদিকে সে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মতিলালের পরিত্যক্ত বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া গ্রামের যে-কয়জন ছোকরা হাঙ্গামা দেখিতেছিল, ঢিল দেখিয়া তাহারাও প্রাণপণে ছুটিয়া আপন-আপন পথ দেখিল।

এবং অনতিবিলম্বেই গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে ধরমতলা পূব্-পাড়ার সমস্ত লোকের সঙ্গে পাঁড়েদের দুই ভাইয়ের ঝগড়া বাধিয়াছে, কিন্তু ঝগড়া যে কি লইয়া বাধিয়াছে, তাহার সঠিক সংবাদ কেহই দিতে পারিল না।

একজন বলিল, "আর একটু থাকলেই জানা যেতো।"

"কিন্তু—"

"যে ঢিল্!"

"আর একটুখানি হলেই আমায় মাথায়।"

দৌড়িয়া আসিয়া সকলেই তখন হাঁপাইতেছিল।

"বাপ্‌রে বাপ্! এ—ত বড়-বড় ঢিল্।"

"খুনোখুনি হল বলে! শোনই না!"

অনেকেই সেই দিকে কান পাতিয়া রহিল। গরুর-গাড়ির গাড়োয়ানদের

বারণ করিয়া দেওয়া হইল। ধান-বোঝাই গাড়ীগুলা ডাকাইয়া তাহারা অন্যপথ দিয়া গ্রামে ঢুকিতে লাগিল।

গ্রামেব পশ্চিমে ছোট যে নদীটি আছে, বর্ষায় তাহাব জলের বং হয় —লাল। পাহাড হইতে গিরিমাটির ঢল নামে। নদীটিব নাম—হিঙুল।

সেই হিঙুলেব তীরে জমিদাবেব খানিকটা 'দো-জমি' বহুকালেব অনাবাদী,—তাহাই চাহিযা লইয়া শশী মোড়ল সে-বছব আলু ও পেঁযাজেব চাষ কবিল।

ফসল সেখানে মন্দ ফলিত না, কিন্তু মাটি ফুঁডিযা আলু ও পেঁযাজেব সবুজ কলিগুলি মাথা তুলিযা উঠিতে না উঠিতেই গাঁযেব এক পাল ছাগলে একেবাব খাইয়া গেল, আব-একবাব কে যে খাইল তাহাব কোনও ঠিক-ঠিকানাই পাওযা গেল না।

পরদিন সকালে ক্ষেত তদাবক করিতে গিয়া শশী মোডল মাথায় হাত দিয়া বসিল। ছোট ছোট আলু-পেঁযাজগুলি তখন সবেমাত্র মাটিব রস টানিযা বড হইতেছিল,—তখনও তাহাবা শিশু। কিন্তু ইহাবই মধ্যে ক্ষেতের ভেলি খুঁডিযা সেই শিশু-শস্যগুলিকে গ্রামেব কোন্ দুষ্ট ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকাবে চুবি কবিযা লইয়া গেছে। ফসল বলিতে মাঠে আব একটিও নাই। পবশু সে জমি 'সেযাৎ' কবিযাছে। ক্ষেতের মাটি তখনও ভিজা। সেই ভিজা মাটিব উপব ছেঁড়া আলুব লতা ও কচি পেঁয়াজেব সবুজ কলিগুলি যেখানে-সেখানে ছডানো রহিযাছে,—এবং তাহারই উপব মানুষের পাযের দাগ তখনও স্পষ্ট জ্বল-জ্বল কবিতেছিল। শশীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

হইবারই কথা।

চাষার ছেলে,—নিজের জমিজমা এক কাঠাও নাই। ভালো জমিদার। চাহিতেই তিনি এটুকু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই হাল-গরু লইয়া পাঁচবার সে এই মাটিতে চাষ দিয়াছে, সার ফেলিয়াছে। তাহার পর এতদিনের অনাবাদী ওই অতখানি পতিত জমি,—লোহার কোদাল দিয়া এক হাঁটু পরিমাণ নীচের মাটি উপরে উঠাইয়া জমি পাট করিতে হইয়াছে। তাহার উপর ভেলি কাটিয়া বীজ পুঁতিয়াছে। এতদিনের এই এতখানি শ্রমসাধ্য ব্যাপার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবার পরে শশী নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি তাহার কাটাইতে পারে নাই।

হেমন্তের পরিচ্ছন্ন আকাশেও কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগতই মেঘ উঠিতেছিল। সঞ্চরমান খণ্ড মেঘের সমারোহে সেদিন চাঁদের আলো হঠাৎ ঘোলাটে হইয়া গেল। শশীর আশঙ্কার আর অবধি রহিল না।

"আর দু-দিন, আর তিন দিন পরে ভগবান!"

মাটির নীচে বীজগুলি হয়তো তাহার পচিয়া যাইবে।

মেঘ কাটিয়া গেল।

শশীর এক-একটি দিন কাটে,—মনে হয়, যেন এক-এক বৎসর। রোজ সে ভেলির মাটি ধীরে-ধীরে সরাইয়া দেখে—।

দেখিতে দেখিতে সেদিন প্রভাতে হঠাৎ তাহার সমস্ত জমিটি সবুজ হইয়া উঠিল। আনন্দে শশীর মুখে সেদিন আর ভাত রুচিল না।

ছাগলে যেদিন পেঁয়াজের কলিগুলি খাইয়াছিল, শশী বলিয়াছিল, "থাক্ —আবার হবে।"

কিন্তু আজ আর সান্ত্বনার কোনও পথই তাহার জন্য উন্মুক্ত রহিল না।

শশীর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বাহিরের বসিবার ঘরে জমিদার একাকী বসিয়াছিলেন।

শশী ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সীতাপতি আচার্য মুখ তুলিয়া চাহিতেই হাতজোড় করিয়া শশী বলিল, "হুজুর!" বলিয়াই সে সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর বলিল, "চোরে সব চুরি করে নিয়ে গেছে হুজুর, আলু পেঁয়াজ, যা-কিছু বসিয়েছিলাম—সব।"

"সব?"

শশীব মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে,—নাকে তেল দিয়ে ঘুমোগে যা।"

"ঘুমোইনি হুজুব,—চোরে নিযে গেল, এই—সবে ছোট গাছ, এখনও—"

কথাটা শুনিবামাত্র তিনি রুখিয়া উঠিলেন।

"ঘুমোস্‌নি হাবামজাদা, পাজি, ছুঁচো? না ঘুমোলে চোরেব বাবাব সাধ্যি কি নিযে যায়! বেশ হয়েছে, আচ্ছা হযেছে, বেরো আমার সুমুখ থেকে।"

শশী তাঁহাকে চিনিত, কাজেই সে উঠিযাও গেল না, জবাবও দিল না, বসিয়া বসিযা কাঁদিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু জানালার বাহিবে কিযৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সুমুখে একটা পানাভর্তি ছোট পুকুবেব কিনারে সাদা রঙের তিনটি বক লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঘুরিযা বেড়াইতেছিল। তাহাদের মধ্যে হঠাৎ একটিব শিকার মিলিয়া গেল। মাছটা সে দুই ঠোঁটের মধ্যে চাপিয়া ধরিযা উড়িয়া যাইতেই, অন্য দুইটা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া অধিকতর সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিল।

তাঁহাকে এমনি নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শশী বলিল, "গাছ খুব পুষ্টলো হয়েছিল হুজুর—"

জমিদার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "হবে না? নদীর ওপর দো-জমি, ওর দাম কত জানিস? আস্‌ছে-বছর থেকে আমি নিজে চাষ করব সেখানে, তোরা পারবিনে, তোরা নেহাৎ আহাম্মক্।"

শশী বলিল, "কিন্তু গাঁয়ের দুষ্ট লোকের দায়ে কিছু পাবেন না হুজুর।"

সীতাপতিবাবু আবার চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "পাব না কী রকম? তুই পেলিনে বলে আমিও পাব না? জেনে-শুনে তবে কেন গিয়ে-ছিলি আমার জমিতে হাত দিতে? আমার হাল-গরু-মুনিষের দাম লাগে না বুঝি? আমার জমির বুঝি খাজনা নেই? টাকা ফেল্—ফেলে উঠে যা বলছি বজ্জাৎ চাষা কোথাকার!"

রাগে এক প্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে পুনরায় তিনি সেই জানালার পানে ফিরিয়া তাকাইলেন।

বক দুইটা তখন উড়িয়া গেছে। ভাঙা একটা পড়ো-বাড়ীর দেওয়ালের উপর প্রকাণ্ড একটা শকুনি বসিয়াছিল। নিমতলার 'ভাগাড়ে' হয়তো গরু পড়িয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ আবার এমনি নীরব থাকিয়া মনে হইল যেন সীতাপতিবাবুর রাগটা খানিক কমিয়া আসিয়াছে।

জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দাদার কানে যদি একবার ওঠে যে, জমি তোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি বিনা-খাজনায়, হাল দিয়েছি, গরু দিয়েছি, মুনিষ দিয়েছি, সার দিয়েছি, অথচ একটি পয়সার দাবী দাওয়া রাখিনি,—তাহলে আমার দশাটা কি হয় একবার······না, না, সে কথা তোরা ভাববি কেন শশী? চুপটি করে ঘরে গিয়ে ঘুমোগে তার চেয়ে,—কাজে লাগবে।

মাগ্-ছেলে নিয়ে উপোস তো দিতেই হয়—এ বছরটাও দে।”

অশ্রুভারে শশীর কণ্ঠ তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, অতি কষ্টে ঢোঁক গিলিযা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, “পাঁচটি টাকাব বীজ এনেছিলাম হুজুর—”

কিন্তু সে-কথার জবাব না দিয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, “ফ্রি না হয় করে দিলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কি জন্যে মরতে ইস্কুলে দিয়েছিস্? বিষণ দের ছেলেটাকে দেখেছিস্? দু-পাতা পড়তে শিখে ভাবল বুঝি-বা লাট্-বেলাট্ই হযে যায়! ও লাঙ্গল ধববে বলে তো আমার মনেই হয় না। এমনি ধিকপিকে প্যাকাটিব মত চেহাবা,—ধরবেই বা কার জোবে?”

ধরা-ধবা গলায় শশী বলল, “না আজ্ঞে, আপনাদেব আশীর্বাদে বলাইকে আমি লাঙলও ধবাব, মাটিও কাটাব।”

সীতাপতিবাবু কহিলেন, “হ্যাঁ, হাত-পাযেব হাডগুলো মোটাসোটা হোক, বুকখানা চওড়া হোক,—মানুষ হোক! মানুষ হোক!”

এই বলিয়া তিনি তাহার পকেটে হাত দিযা কি যেন বাহিব করিলেন, এবং তাইতে তিনি শশীর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, “মিছেমিছি আমার কপালে এই দণ্ডটি ছিল।”

পাঁচ টাকাব একটি নোট দেখিযা শশী প্রথমে থতমত খাইয়া গেল। কি যে বলিবে কিছুই খুঁজিযা পাইল না। বলিল, “টাকা আমি—আজ্ঞে হুজুর—টাকা—আপনার শ্রীচরণে—আমি—”

“চাইনি। কেমন? বেশ, দরকার না হয ফিরে দিয়ে যাও। তবে আর মুখ্যু চাষা বলেছে কাকে? কালকেই আবাব সেই আমার দুয়োর ভিন্ন গতি নেই বাবা! বীজের দরুণ পাঁচ-সাতটি টাকা আমার লোকসান হল হুজুর, মেয়ে উপোস, ছেলে উপোস, বৌ কাঁদছে—”

বলিয়াই তিনি একবার দরজার দিকে তাকাইলেন।

সুমুখের ছোট বাগানটির এক কোণে, কাগ্‌জি-লেবুর একটা গাছে সে-বছর বিস্তর লেবু ধরিয়াছিল। কিন্তু মজা এই যে—সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই যে না আলস্য করে, সে-ই দুটা ছিঁড়িয়া লইয়া ঘরে চলিয়া যায়।

পাশেই পণ্ডিত-গিন্নির ঘর,—সুবিধা তাহারই সবচেয়ে বেশি। দিন নাই, রাত নাই, লেবু খাওয়াটা তাহার ঘরে খুব জোর চলিতেছিল। সে-দিন সে হাতে হাতে ধরা পড়িবামাত্র হ্যা হ্যা করিতে লাগিল। অসংবদ্ধ অর্থহীন ভাষায় নিজের দোষ ঢাকিবার চেষ্টাও সে কম করে নাই। বলিল, "ছোট ছেলেটার অসুখ বাবা—তোমারই খাই, তোমারই পরি, এ আর বেশি কথা কি,—ইস্টিশানের খোঁড়া-ডাক্তারকে দেখালাম, গাছের ফল, তাই বলি দুটো এ আর—"

সীতাপতিবাবু সেদিন তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। বলিবার আছেই-বা কি।

আজ আবার সেই পণ্ডিত-গিন্নিকেই বাগানের দরজায় ঢুকিতে দেখিয়া শশীর সহিত কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "চুরি করে নেওয়া কেন বাপু, দু-চারটে দরকার, চেয়ে নিলেই তো হয়!"

কিন্তু যাহার উপদেশে কথাটা বলা হইল সে তখনও দূরে। কাজেই জবাব দিল শশী।

হাত জোড় করিয়া বলিল, "চুরি? আজ্ঞে আমি তো জীবনে—কস্মিন্‌কালেও—"

"তোকে বলিনি।"

শশী পিছন ফিরিয়া দেখিতে যাইতেছিল, কিন্তু পণ্ডিত গৃহিণী তখন চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সীতাপতিবাবু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

পণ্ডিত-গিন্নির মিশি-ছোপানো কালো রঙের দুই পাটি বড বড দাঁত সর্বপ্রথমে বাহিব হইয়া পড়িল ; তাহার পর সে তাহার দাড়ির মত পাকানো হাত-দুইটি নাডিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "তুমি আমাদের কোলে-পিঠে মানুষ-কবা ছেলে সীতেনাথ, অধর্ম তোমাকে আমি করতে দেব না কখনও।"

তাঁহাকে সর্বপ্রকার অধর্ম অনুষ্ঠান হইতে বিবত কবিবার জন্য পণ্ডিত-গৃহিণীর দবদী অন্তঃকরণে সহসা আজ এত বেশি মমতাবোধ কেন যে এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল—সীতাপতিবাবু সে কথা বুঝিলেন, কিন্তু বুঝিয়াও তাহাকে সব কথা বলিবার অবসর দিযা নিজে চুপ করিয়া রহিলেন।

পণ্ডিত-গিন্নি বলিল, "আমাদের গুষ্টি হল পণ্ডিতের গুষ্টি। দুগ্যো-বাংলার পাঠশাল্ আমাদেব হকেব জিনিস ; চোদ্দ পুরুষ ধবে ওই পাঠশাল্ আমাদেব। দেবেন ছাডা ওখানে আব কেউ ছেলে পড়াতে পাবে না, তা আমি বলে বাখছি বাবা !"

এই বলিয়া জবাবের জন্য একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "কেন, ছেলেবেলায় পডনি আমাদেব দেবেনের বাপের কাছে ? লেখাপড়া তোমরা শিখলে কোথা ? সেই তারই দৌলতে। সে আজ বেঁচে থাকলে—"

বলিতে বলিতে পণ্ডিত-গিন্নি চট্ করিযা এক খাম্চা কাঁদিয়া লইয়া চোখের জল মুছিয়া নাক ঝাডিয়া আবার তেমনি দিব্য সহজ গলায় কহিল, "আমার শ্বশুরের কাছে পড়েছে তোমার দাদা। আর আমার

শ্বশুরের বাপের কথা না হয় ছেড়েই দাও, তিনি ছিলেন ল্যায়নঙ্কা, তেমনি পণ্ডিত ক-জন মেলে? এক-এক কাজ-কম্মে যেতেন আর এমনি বড় বড পিতলের ঘডা-কলসি, চাদর-গামছা ভিন্ন ঘরে ঢুকতেন না,—আর সে-সব কাপড কি,—সে-সব ঘডা কি! তার হাতের লেখা তাল পাতার পুঁথি এখনও গাদাবন্দি গোঁজা রয়েছে আমার রান্নাঘরের চালে। তাব একটি আখর উঠোয় এমন কার বাবার সাধ্যি!"

আর ভালো লাগিতেছিল না, সীতাপতিবাবু বলিলেন, "তোমার দেবেন ছেলে-পডাবার কিচ্ছু জানে না, তাই গাঁয়ের পাঁচজনা মিলে রাশু ভট্‌চাজ্‌কে পাঠশালাটি দিয়েছে,—বুঝলে?"

বাশু ভট্‌চাজেব নাম শুনিযা পণ্ডিত-গিন্নি জ্বলিয়া উঠিল।

বলিল, "আমাব শ্বশুবেব গদিতে শেষকালে বসলো কিনা ঐ রেশো? ছেলে পডাতে আমার দেবেন জানে না—জানে তোমাব ওই রেশো ভট্‌চাজ্? ও মা আমার কে রে! কই, বলুক দেখি আরও দশজনা,—গাঁয়েব ছেলেবা কাকে ভয় কবে? রেশোকে, না আমাব দেবেনকে? দেবেনকে দেখ্‌লে ছেলেবা সব কাপডে মোতে, তা জানো? ওই আমার উঠোনেব কুলগাছটি তো দেখেছ? পাকা কুল সেই চোত্-বৈশাখ্ পর্যন্ত থাক্‌বে। কেন, কই, পাডার ছেলের দৌরাত্ম্যিতে আর কারও গাছে থাকে? দেবেনের ভযে ছেলেবা আমার দুয়োর মাড়ায না। আর—আমাদের যুগ্‌লী, দেবেনের চেয়ে বড়ই তো? দিদি হয। কিন্তু কই, আমার দেবেনেব সাক্ষাতে রা-টি কাড়ুক্ দেখি ঘরে? তবকারি কই এতটুকু কম দিক দেখি পাতে?"

পণ্ডিত-গিন্নি সহজে হটিবার পাত্রী নয়। কি বলিয়া যে তাহাকে বুঝাইয়া বিদায় করিবেন সীতাপতিবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ভাবিতে হইল না।

সুমুখে রাস্তার উপর অনেকক্ষণ হইতেই সমবেত কয়েকজন মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটা উন্মত্ত জনস্রোত তাঁহার সেই ছোট বাগানের পথ ধরিয়া হুড়মুড়্ করিয়া একেবারে তাঁহার দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সীতাপতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যে-দৃশ্যটি সর্বপ্রথমেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহাতে এই নিরীহ নির্বিরোধ মানুষটির একটুখানি চমকিয়া উঠিবার কথা।

বিক্ষুব্ধ সেই জনসংঘের সর্বাগ্রে রাখহরি পাঠকের দুই হাত দুইজন ধরিয়া ধরিয়া হাঁটাইয়া আনিতেছিল, মাথাটা তাহার ফাটিয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ। মাথার ক্ষতস্থান হইতে তখনও পর্যন্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁচা রক্ত ঝরিতেছিল। মুখের উপর রক্তের দাগ কালো রং ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া গেছে।

হরেকিষ্ট তাঁতিরও সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত,—কয়েক জায়গায় কয়েকটা আঁচড়ের চিহ্ন তখনও বর্তমান।

কাহারও সহিত মারা-মারি হাঙ্গামা যে একটা-কিছু হইয়াছেই এবং কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পাঁড়ে-পাড়ার যে গোলমাল তিনি স্বকর্ণে শুনিয়া-ছিলেন তাহাও যে ইহাদের লইয়াই, সে কথা বুঝিতে সীতাপতিবাবুর অধিক বিলম্ব হইল না।

রাখহরি তাহার ফাটা মাথা লইয়াই তাঁহার পায়ের কাছে সটান্ লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

"রক্ষা করুন হুজুর! আপনি আমাদের মা-বাপ্, আপনি রাজা,—আপনি রক্ষা করুন!"

হরেকৃষ্টও সেই সঙ্গে তাঁহার পা-দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—আপনিই—"

কিন্তু কি হইয়াছে, কেন যে তিনি তাহাদের রক্ষা করিবেন এবং এই রক্তারক্তি মারামারির হেতুটাই বা কি, তাহার সঠিক সংবাদটি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উপর্যুপরি কয়েকবার প্রশ্ন করিবার পর, হরেকৃষ্ণ তাঁহার পা দুইটি ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং এই সর্বনাশের হেতুটি যে কি, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার নিমিত্ত বারকতক ঢোঁক গিলিয়া নিজেকে প্রথমে প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "শুনুন তবে আজ্ঞে! নিবেদন পাই।"

এই বলিয়া তাহার ভনিতা শুরু হইল।

তাহার পর, সে যে কেমন করিয়া গণেশ পাড়ের মাথাটা চেলাইয়া দু-ফাঁক করিয়া দিতে পারে, এবং কিশোরী পাঁড়ের স্থূল উদরের পুরু চামড়াটি কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে নাড়িভুঁড়িগুলি যে-কি-প্রকারে মাত্র মিনিট-কয়েকের মধ্যেই টানিয়া বাহির করিতে হয়,—রাগের মাথায় তাহারই ইতিহাস সর্বপ্রথমে সে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল।

অসহিষ্ণু হইয়া সীতাপতিবাবু তাহাকে জোরে এক ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চোপ্ হারামজাদা পাজি ছুঁচো, চোপ! ও-সব শুনতে চাইনে তোর কাছে,—কী হয়েছে তাই বল্, নইলে—উঠে যা এখান থেকে—ভাগ্!"

চোখের উপরের খানিকটা রক্ত হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া রাখহরি এইবার উঠিয়া বসিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আমি বলি। তুই চুপ কর্ হরেকিষ্ট!"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রাখহরি যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, গত কয়েকদিন হইতে উপর্যুপরি তাহার মাঠের পাকা ধান চুরি যাইতেছিল। যাই যাই করিয়া মাঠের দিকে একদিনও তাহার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু আজ সে হঠাৎ মাঠে গিয়া দেখে যে, গণেশ পাঁড়ের বড় ছেলে চৈতন নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহারই মাঠের উপর গরু চরাইতেছে এবং কতকগুলা পাকা ধান কাস্তে দিয়া কাটিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ক্ষেতের একপাশে আঁটি বাঁধিয়া গাদা করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই সহিত প্রথমে দু-এক কথা বলা-কওয়া হয়। কিন্তু চৈতন কিছুতেই শোনে না—গরু সে চরাইতেই থাকে। নিরুপায় হইয়া রাখহরি তখন জন-দুই-তিন লোককে সাক্ষী করিয়া নালিশ করিবার জন্য আদালতে যাইতেছিল। পাঁড়ে-পাড়ার রাস্তায় গণেশের সঙ্গে দেখা। চৈতন ইতিমধ্যে ঘরে ফিরিয়া তাহার বাবাকে সংবাদ দিয়াছে। গণেশ পাঁড়ে চোখ লাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাস্?" রাখহরিও রুখিয়া জবাব দেয়, "আদালতে। তোমার নামে নালিশ করতে।" কথাটা শুনিবামাত্র লাঠি হাতে লইয়া সে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। রাখহরি বলিল, "কি রকম?"

"এই রকম।" বলিয়া গণেশ পাঁড়ে তাহার হাতের লোহা-বাঁধানো লাঠি দিয়া প্রথমেই এক লাঠি এইখানে মারে।

হাত দিয়া রাখহরি তাহার রক্তাক্ত মাথার ডানদিকটা দেখাইয়া দিল।

"তারপর এইখানে।" বলিয়া রাখহরি তাহার অঙ্গের আর-একটা স্থান দেখাইতে যাইতেছিল, হরেকিষ্ট বলিল, "আর কিশোরী? চৈতন? ওদের নাম করলে না যে ঠাকুর?"

ঘাড় নাড়িয়া রাখহরি বলিল, "হাঁ, ওরাও।"

হরেকিষ্ট তখনও হাতজোড় করিয়াই ছিল। বলিল, "আবার

বলে কি-না থানা-আদালতের নাম করেছিস কি খুন করেছি। চৈতন, তুই ঘাঁটি আগ্‌লে বসে থাক্‌, এই দিকে শালারা পেবোবে কি আমায় খবর দিস্‌।"

সীতাপতিবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তোকেও মেরেছে নাকি? তুই কোথায় ছিলি?"

তৎক্ষণাৎ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত হবেকিষ্ট কহিল, "আজ্ঞে আমি তো সঙ্গেই। আমিই তো সাক্ষী। আমাকে যৎপবনাস্তি,—এইখানে, এইখানে, এইখানে আর এইখানে।" বলিয়া সে তাহাব ধূলি-ধূসরিত অঙ্গেব প্রায় সর্বত্রই মারেব দাগ দেখাইয়া দিল।

সীতাপতিবাবু একবাব স্বমুখেব পানে তাকাইলেন। গ্রামেব বিস্তব লোক সেই ছোট বাগানখানিব মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইযাছে। গাছ-পালাগুলি বুঝি আজ আর থাকে না!

হরেকিষ্ট বলিল, "উল্টো বলে কিনা ডিমওযালাব কাছ থেকে আমরা টাকা কেড়ে নিয়েছি—"

কিন্তু সীতাপতিবাবু সে-কথা শুনিতে পাইলেন না। সম্মুখে জনতাব দিকে তাকাইযা কহিলেন, "তোবা কি জন্যে হাঁ কবে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ বাপু? যা বাড়ী যা। বাড়ী যা সব,—এখানে কি আছে তোদের?"

কেনাবাম মুখুজ্যে পাশেই দাঁড়াইযাছিল। জমিদারেব কাছে ডিমওযালাব কথাটা পট্‌ কবিয়া বেফাঁস বলিয়া ফেলা হরেকিষ্টর উচিত হয় নাই। কাজেই ইঙ্গিতে-ইসারায় সে-কথাটা তাহাকে বুঝাইযা দিবাব জন্য হরেকিষ্টব মুখেব পানে তাকাইয়া কেনারাম বারকতক তাহাকে চোখ টিপিল। কিন্তু চোখেব পাতা দুইটা যাহাব দিনরাত উঠা-নামা করে, তাহার চোখ টেপা না-টেপা দুই-ই সমান। হরেকিষ্ট আবার কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

কেনারাম তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, ও-কথা ছেড়ে দাও। দোআনি দুটি তো এখনও আমার কোঁচড়ে-কোঁচড়েই ফিরছে, কী যে করব, কাকে যে দেব তা তো ভেবেই পাই না ছাই!"

সীতাপতিবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কিসেব দু-আনি? কার? কাকে দিতে হবে?"

কথাটাকে তৎক্ষণাৎ উডাইয়া দিয়া কেনাবাম বলিল, "ও-ই এক-বেটা ইস্টিশানের মেড়ুযা দিয়ে গিয়েছিল ধম্মরাজেব পেনামী—পূজোব জন্যে যৎসামান্য কিছু—। আব, তো-বেটাব আচ্ছা আক্কেল যা হোক, বেটা তাঁতি কিনা! বললেই হল অমনি লোকের নামে দোষ দিয়ে যা-তা! গণ্শা না-হয বজ্জাৎই ধবে নিলাম,—তাই বলে কি—আবে এই! তোবা কি দিবি আজ বাগানটাকে ভেঙে? না, কী মনে কবেছিস কি? এ কি ভালুক-নাচ, না বাঁদর-নাচ, যে, সবাই মিলে দেখ্তে এসেছিস্ ছুটে?"

এই বলিযা খানিকটা চেঁচাইযা সীতাপতিবাবুব মুখের পানে তাকাইয়া চুপি-চুপি কহিল, "তাহলে এখন কি করা যায় বল দেখি ভায়া? মেয়েছেলে নিয়ে গাঁযে বাস করা—এ যে একটা—"

কথাটা তাহাব আব শেষ হইল না। এত বড গুরুতব সমস্যার চিন্তায় মুখখানি তাহার দেখতে দেখিতে অত্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে চোখেব পাতা দুইটিও খুব ঘন-ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কববে আবার কি? ঘরে ঘরে মিটিয়ে নিতে পার নাও, নইলে নালিশ করে এস।"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিয়াই বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, নালিশ আমরা ও-বেটার নামে একনম্বর ঠুক্‌বই।"

সীতাপতিবাবু পুনরায় ভিতরে গিয়া বসিতেছিলেন, কেনারাম বলিল, "নালিশ তো করবে, কিন্তু যায় কেমন করে? পেরোবে কেমন করে? ওরা যে ওৎ পেতে বসে আছে।"

কেনারামের কথাটা শুনিয়া তিনি রাগিয়া উঠিলেন বলিলেন, "আমি কি নিজে গিয়ে পার করে দিয়ে আসব না কী মতলব তোমাদের?"

কেনারাম খানিকটা জিব বাহিব কবিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "রাম বল। তাই কি আর বলতে পাবে কেউ? তবে কিনা এই একটা চাপ্‌রাশী-টাপ্‌রাশী, দু-একজন লোক—"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা মারামারি ফুটোফুটি কর, আব আমি লোক জুগিয়ে মরি! নিয়ে—দিক্ বেটা আমাকেও এই সঙ্গে গেঁথে! বলিহাবি বুদ্ধি যা হোক তোমাদের! না—না, ও-সব হবে-টবে না, ও-সব হবে না আমাব কাছে। তোমরা যা-খুশি তাই কব,—মাবামারি হাঙ্গামাতে আমি নেই।"

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তিনি চুপ করিযা থাকিয়া আবার সেই জানালার কাছে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা যদি একবার শোনে একথা, তাহলে অপমানের আর বাকি থাকবে না কিছু।—ভয়েই যদি মবতে হবে জানিস্, তো কী দরকার ছিল তোদেব মাবামারি করতে যাবার—বল্ দেখি বাপু? ও বেটা চোযাড, ও বেটা ছোটলোক, ও সব পাবে। ও খুন করতে পাবে!"

বেগতিক দেখিয়া বক্তাক্ত কলেবরে বাথহরি নিজেই তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "পড়ে পড়ে মার খেতে হয় তাহলে হুজুর, নালিশ-মোকর্দমা আর হয় না।"

অনেকক্ষণ হইতেই সীতাপতিবাবু রাখহরির মুখের পানে তাকাইতে পারিতেছিলেন না, এইবার মুখ তুলিয়া তাহার সেই রক্তরঞ্জিত শুষ্ক মুখখানার দিকে তাকাইতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

"আঃ! জ্বালালি দেখছি তোরা আমায়! যা তবে তাই, যা আমার ছেলের কাছে, সে-ই সব ঠিক করে দেবে, বলবি তোমার বাবা বললে, যা। ওরে কে আছিস্? নবীন কোথায়, নবীন কোথায় জানিস্ কেউ?" বলিয়া একবার তিনি বাহিরের দিকে তাকাইলেন।

কৌতূহলী দর্শকের মধ্যে কতকগুলা ছেলে তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। কে একজন বলিয়া উঠিল, "নবীনদা ইস্কুলে।"

ছেলেটাকে কাছে ডাকিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া দিলেন, "বল্‌গে যা—তোমার বাবা বললে, দু-জন চাপরাশী আর একজন চৌকিদার বেশ জোয়ান দেখে—বেশ করে বলে দেয় যেন তাদের,—ফের্ যদি রাখুর গায়ে কেউ হাত তুলতে আসে তো……আচ্ছা যা, নবীনকে সে-সব কিছু বলতে হবে না, বলে সে দেবেই।"

স্কুলঘর বেশী দূরে নয়। দূরের সে পুরাতন ইস্কুলটি এখন নূতন ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে। যিনি ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন দরিদ্র এবং বোধ করি সেই কারণেই তাঁহার মৃত্যুর পর ইস্কুলটিরও মরিবার জো হইয়াছিল,—সম্প্রতি তাহাই আবার বাঁচিয়া উঠিয়া নবজীবনের প্রবল ধাক্কায় ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

জমিদারের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পাশে পরিত্যক্ত একটি ভিটের উপর গন্ধ-গোকুল ও ফণীমনসার জঙ্গল কাটিয়া নবীনের উৎসাহে কয়েকটি

চুনকাম করা খড়োঘর তৈরী হইয়াছে ; স্বর্গগত প্রতিষ্ঠাতার বড ছেলেটি পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে শহরের আপিসে কেরানীর কাজ ছাড়িয়া হেড-মাস্টারীতে বহাল হইয়াছেন ; আর-একটি ছেলে তাঁহার দূরের এক কয়লা-কুঠিতে হারমোনিয়াম ও বাঁশী সাবানোর দোকান খুলিয়াছিল, শিক্ষকতা করিবার জন্য সেও গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামেরই এমনি আরও কয়েকজন ছোকরা লইয়া স্কুলটি এখন কোন-রকমে টিম-টাম করিয়া চলে।

সেকেণ্ড পণ্ডিত ভট্‌চাজ্‌-মানুষ, ভিন্ন-গ্রামের কয়েকজন পয়সাওয়ালা চাষা তাঁহার যজমান। তিনি স্পষ্টই বলেন—

"আট-আনার পণ্ডিতী করতে গিয়ে দু-টাকার যজমান তো আমি ছাড়তে পারি না নবীন!" এবং কি-একটা শ্লোক আওড়াইয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে তিনি ইহাও বলেন যে, ঘরে দুগ্ধবতী গাভী থাকিতে বলদ দোহন করিবার পেশা তাঁহার নয়।

ইহার উপরে আর কথা চলে না। নবীনই গিয়া তাঁহার ফাঁকা-ক্লাসের ভাঙা চেয়ারখানি দখল করিয়া বসে ; ছেলেদের গল্প শুনায়।

ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও ছেলেরা উঠিতে চায় না, বলে, "তারপর— সার্— তারপর ?"

নবীন ধমক দিয়া বলে, "তারপর জ্যামিতি।"

ছোট ছেলে,—গল্প শুনিবার লোভ সামলাইতে পারে না, নিতান্ত অনুনয়ের সুরে দু-একজন বলিয়া উঠে, "না সার্, জ্যামিতি নয়,—আপনি।"

হাসিতে হাসিতে নবীন পুনরায় গল্প করিতে বসে।

হেড্‌পণ্ডিত মহাশয় বাইরে চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া তামাক টানিতে টানিতে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেন। ছেলেরাও অঙ্ক-জ্যামিতির হাত

হইতে সেদিনের মত বাঁচিয়া যায়।

সেকেণ্ড-পণ্ডিতের যজমান-ঘরে জাঁকালো-রকমের একটা অন্নপ্রাশন ছিল। ছেলেরা তন্ময় হইয়া মহাভারতের গল্প শুনিতেছিল। এমন সময় সীতাপতিবাবুর পাঠানো সেই ছেলেটা নবীনের কাছে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার সংবাদটি বহন করিয়া আনিল, এবং সকলেই যে তাহার অপেক্ষায় অদূরে রাস্তার উপর শিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া আছে সে-কথাও তাহাকে জানাইয়া দিল।

পাঁড়ে-পাড়ার গোলমাল সে শুনিয়াছিল, কিন্তু এমন যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে তাহা সে ভাবে নাই। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছেলেরা গোলমাল করিতেছিল, খুব জোরে একটা ধমক দিয়া নবীন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিবামাত্র রাখহরি হাউমাউ করিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল,—"এই হল ভায়া, তোমার জমিদারীতে বসে শেষ পর্যন্ত মারই খেয়ে এলাম।"

কেনারাম বলিল,"যা হোক এর একটা-কিছু কর বাপ।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা হরেকিষ্ট সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

দুইজন চাপরাশী ডাকাইয়া নবীন কহিল, "যাও তোমরা এক্ষুনি নালিশ করে এস।"

চাপরাশীদের বলিয়া দিল, "মহতাপ্, ফের্ যদি ওরা মারামারি করতে আসে, আমার হুকুম নেই বলে ফিরে এস না যেন।"

"যে হুকুম মহারাজ!" বলিয়া চাপরাশী দুজনেই সেলাম করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

"শুধু সেলাম ঠুক্‌লে চলবে না মহতাপ্, গাঁয়ের ভেতর এসব বড়

সুবিধের ব্যাপার নয়।”

পথের ধারে জমিদার-কোটাল হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল, নবীন বলিল, “তোমার চাকরি আর থাকে না কোটাল!”

কোটাল বলিল, “হুজুর—”

“হুজুর নয়। দিনে-দুপুরে লোকের ধান চুরি যাবে, পাকা ধান গরুকে খাইয়ে দেবে,—এসব চলবে না, চলতে পারে না।”

“পাঁড়েদের সঙ্গে হুজুর—”

নবীন বলিল, “সেই জন্যেই তো বলি—চাকরিতে জবাব দাও।”

এমন সময় কপিল চক্কোত্তি চাকু ছুরি দিয়া বাঁশের একটা কঞ্চি কাটিতে কাটিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুপুর বেলাটা প্রায়ই তাহাকে এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়। থার্ড-পণ্ডিত ছেলে ঠেঙাইতে ওস্তাদ, ছেলেদের পিঠে এমন নির্মমভাবে ছড়ি ভাঙিতে আর কেহ পারে না। রোজ তাহার দু-তিনটি নূতন ছড়ির প্রয়োজন হয়। এবং সে ছড়ি জোগায়—কপিল। ছেলেরা মার খায়, কাঁদে; কপিল তাহাই দেখবার জন্য একটি বেঞ্চের একপাশে গিয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া থাকে,—দেখে, আর হাসে। এমন-কি নিত্য নূতন ছড়ি কাটিয়া দিবার জন্যই কিছু চাল বিক্রি করিয়া স্টেশনের কোন এক মনোহারীর দোকান হইতে কপিল সেদিন ওই ঝকঝকে ধারালো ছুরিখানি কিনিয়া আনিয়াছে।

কেনারামকে দেখিবামাত্র ছুরি বন্ধ করিয়া কপিল তাহার হাতের কঞ্চিখানা নাচাইতে লাগিল।

“—পড়া হয়নি কেন শূয়ার, পড়া করিস্‌নি কেন? নে—হাত পাত! হাত পাত! পেতেছিস?”

বলিয়াই কপিল তাহার হাতের ছড়িটা শিবমন্দিরের ইট-বাঁধানো

শানের উপব চড়াম চড়াম কবিয়া বারকতক বসাইয়া দিয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, "বল্ এবারে বল্—কেনা, কেনৌ, কেনাঃ! কেনাম্ কেনৌ, কেনাঃ! কেনেন, কেনেভ্যাম্, কেনেভ্যঃ! বাস্ ছুটি,—যা চলে যা ”

ছড়ি নাচাইতে নাচাইতে বাস্তাব লোকজনেব ভিড় ঠেলিয়া কপিল আপন মনেই কিয়দ্দূব চলিযা গেল। কিন্তু এই যে এতগুলা লোক এখানে কেন জড হইয়াছে, বাথহবিব মাথাই বা ফাটিল কিসের জন্য, সে-সব বিষয় জানিবাব কোনপ্রকাব আগ্রহ-ঔৎসুক্যই তাহাব দেখা গেল না।

কিযদ্দূব গিয়া আবার সে সেইখানেই ফিবিয়া আসিল।

লোকজন সঙ্গে লইযা আদালতে যাইবাব জন্য তাহাবা তখন উঠিযা দাঁডাইয়াছে।

কপিল হযতো এতক্ষণ রাথহবিকে দেখিতে পায নাই, এইবাব সেই-দিকে তাহাব দৃষ্টি পডিতেই বলিযা উঠিল, "এই যে। বা! আচ্ছা হযেছে বেথো, তোব আচ্ছা হযেছে। যেমন কম্ম তেমনি ফল, —পড়া হযনি কেন শূয়াব! কেন তোব পডা হযনি সেই কথাই আগে শুনি।"

বলিতে বলিতে কপিল পুনবায সেই স্কুলঘবেব থার্ড পণ্ডিতেব ক্লাসটিতে গিয়া ঢুকিল।

জমিদারেব চাপবাশী মহতাপ সেদিন পাকা ধানেব ক্ষেত হইতে গণেশ পাঁড়ের দুইটি গরু ধবিয়া আনে।

নবীন বলিল, "দিয়ে এসো খোঁয়াড়ে।"

মক্বুল মিঞার খোঁয়াড ঠিক পাঁড়ে-পাড়ার পাশেই। হাতে একটা

লম্বা লাঠি লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া মহতাপ গরু দিতে গেল।

মক্‌বুল ঘরের সুমুখে বাঁশ-বাঁখারী দিয়া খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া দিয়াছে, দিনের রৌদ্রে এবং রাত্রির হিমে অপরাধী গরু-বাছুরগুলা সেই ফাঁকা জায়গাটায় আটকানো থাকে, জলে-গোবরে দিনরাত সেখানে কাদা প্যাচ্‌-প্যাচ করে, বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ওঠে, মশা ও মাছির ভ্যান-ভ্যানানিতে মানুষ সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

পাশেই তাহার ছোট ভাই ইয়াসিনের ঘরের চালার চতুর্দিকে ছোট-বড় নানা রকমের চটের পর্দা ঝোলে, কয়েকটা পোশা-মুরগী চারিদিকে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং সেই চটের পর্দার অন্তরাল হইতে দিনরাত একটা হাত-সেলাই-এর কল-চালানোর একঘেয়ে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

ঘরের এই আব্রু সম্বন্ধে এত বেশি সতর্ক ইয়াসিন পূর্বে কখনও ছিল না, কিন্তু মক্‌বুলের সঙ্গে কতকগুলো চুরি করা চামড়ার ভাগ লইয়া সম্প্রতি একটা মামলা-মোকর্দমা হওয়ার পর হইতে ইয়াসিনের ঘরে চটের পর্দার সংখ্যা যেন কিছু বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইয়াসিন মিঞা সে কথা স্পষ্টই স্বীকার করে। বলে, "হাজার হোক মেয়েটার বয়েস হয়েছে কর্তা। আর ওই মেয়েটাই চব্বিশ ঘণ্টা চালায় বসে সেলাই-এর কাজ-টাজ করে,—ঘরে সব সময় থাকি-না-থাকি……ভাই হলেও ও শালাকে আমি বিশ্বাস করি না……হ্যাঁ—।"

কিন্তু মক্‌বুল তাহার বাঁখারি-ঘেরা খোঁয়াড়ের পাশে বসিয়া ফরসির নলে খাশ-অম্বুরি তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে, শহরের বাদশাহী জরদা দেওয়া পান চিবায়,—এ সব ছোট কথায় কান দিবার মত অবসর

এখন আর তাহার প্রায়ই থাকে না।

বিশেষ করিয়া বৎসরের মধ্যে ধান কাটিবার এই সময়টাই মক্‌বুল মিঞাব মেজাজ পাওয়াই দায় হইয়া ওঠে। নূতন খড়ের আশায় পুরানো খডগুলি অনেকেই তখন বিক্রি করিয়া ফেলে, গরু-বাছুরের দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, গ্রামের দক্ষিণে গোচারণের মাঠটিকে তো রেল-স্টেশনের ইমারত-অট্টালিকা, দোকান-দানি আর কল-কাবখানাব মাঝে খুঁজিয়াই পাঁওযা যায না,—ক্ষুধায আর্ত শীর্ণ কঙ্কালসাব গরুবাছুরগুলা একবার ছাডা পাইবামাত্র হাঁ হাঁ করিযা লোকের পাকা ধানে গিয়া লাগে। খোয়াড়ে টাকা-পযসার আমদানি হইতে থাকে,—মক্‌বুলের ষোল-আনা পড্‌তা পডিয়া যায়।

এখন আব তাহার দু-চাব আনা পয়সা গাযেই লাগে না।

মহতাপ্‌ গরু লইয়া অনেকক্ষণ হইতে দাঁডাইযা ছিল। পানেব খানিকটা পিচ ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া মক্‌বুল বলিল, "গণেশ পাঁড়ের গরু নেবার বহুৎ হাঙ্গামা সিং-জি! মাপ কব,—ও আমি নিতে পারব না।"

মহতাপ্‌ জিজ্ঞাসা কবিল, "কেন লিবে না শুনি?"

মক্‌বুল আবার খানিকটা পিক ফেলিযা ঘাড নাড়িয়া কহিল, "পয়সা দেয় না, উল্টো জবরদস্তি মাবপিট করতে আসে। ও নিযে আমার লাভ কি?"

এই বলিয়া সে তাহাব ফর্‌সিব নলে বাবকতক টান দিল। বলিল, "তার চেয়ে সিধা বাৎ বলি,—এই পথে ইস্টিশনের খোঁয়াড়ে দিয়ে এস—যাও।"

মহতাপ্‌ গরু লইয়া স্টেশনেই যাইতেছিল। ইয়াসিন তাহাকে ফাঁকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলে কি?"

মহতাপেব জবাব শুনিয়া সে তাহার ঠোঁট দুইটি উল্‌টাইয়া কহিল "ভয়-তরাসে মানুষের সাহস কোথা পাবে সিং-সায়েব? আসছে বছব আমি খোঁয়াড ডাকব—নিলেমে। গরু যত পার দিও তখন। কাউকে 'কেযার' করি না আমি—আমি কাউকে ভয করি না।"

গরু যে তাহাব চালান গিযাছে গণেশ পাঁড়ে আগেই সে কথা টেব পাইয়াছিল। স্টেশনের পথে একা পাইযা মহতাপ্‌কে আগলাইল, —গনেশ, কিশোবী ও চৈতন। মাবপিট কবিয়া গায়েব জোরে গরু ছিনাইযা আনিল।

মহতাপ্‌ অমনি ছাড়িল না, লাঠি দিয়া চৈতনের একটি হাত সে বীতিমত জখম করিয়া দিল।

ঘবে গরু বাখিয়া গণেশ তৎক্ষণাৎ চৈতন ও কিশোবীকে লইয়া বাহিব হইযা পড়িল, এবং সেই দিনেব খোলা কাছাবিতে এই বলিয়া নালিশ রুজু কবিল যে, জমিদাব ও তাহাব ছেলে নবীন, অনেক লোক-লস্কব লইযা সেদিন সদলবলে তাহাব ঘর লুট করিতে আসে; এবং লুট-তবাজ না কবিতে পাইয়া তাহাব ছেলে চৈতনকে যৎপবোনাস্তি প্রহাব কবিযা দিযা বাড়ী চলিযা যায়। অত্যাচারী জমিদাব অত্যন্ত প্রবল। অধীন গরীব। সুতবাং স্বচক্ষে যাহারা এ-ব্যাপাব দেখিযাছে, তাহাবাও জমিদারেব ভয়ে সাক্ষী দিতে নারাজ। এইবাব হুজুব মালিক।

এবং গণেশ নাকি ইহাও বলিযা আসিয়াছে যে, সে তাহাব মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত, সম্পত্তি, আজ হইতে সবই ওই শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সংবাদটি পত্রে-শাখায় পল্লবিত হইয়া নবীনের কানে পৌঁছিতে দেবি হইল না।

কাহার একটা দেওযানী মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য দিতে ওপাড়াব হারু লাএককে সেদিন আদালতে যাইতে হয। ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপাবটা সে-ই প্রথমে নবীনকে বলে।

"বেটা খালি আমাব দিকে গর্জে গর্জে তাকায, বুঝলে নবীন? আর-একটু হলেই হযে যায আব-কি—আদালতেব উপবেই। নিজেই সাম্‌লে নিলাম শেযে,—বলি, কাজ-কি বেটা ছুঁচো বেহায়া ছোটলোকেব সঙ্গে—"

বৈঠকখানাটি সীতাপতিবাবু নিজেই দখল কবেন, বিশেষ প্রযোজন না হইলে নবীন বড-একটা তাঁহাব কাছে ঘেঁষে না, স্কুলেব একটি ঘবে প্রাযই সে চুপ কবিয়া বসিয়া থাকে। সেদিনও সে বাহিবেব উঁচু বকেব উপব পা ঝুলাইযা বসিযাছিল।

হারু লাএক তাহাব হাতে-ঝুলানো ফুলকপিটি তুলিয়া ধবিয়া বলিল, "হুঁঃ! সস্তা হযেছে,—সস্তা হযেছে না আবও-কিছু! এই তা দেখছ কতটুকুন,—দশ পযসাব একটি আধলা কমে ছাডলে না।"

আদালত-ফেবৎ তখনও সে বাড়ী ঢুকে নাই।

নবীন বলিল, "এখনও বাড়ী ঢোকেননি বুঝি? যান—আপনি বাড়ী যান।"

বলিয়া সে নিজেও উঠিল।

"কই আব গেলাম বাবাজি? এই এত বড খবর—তোমাকে আগে না জানিয়ে কি আব······এই তুমিই হযতো বলতে যে হারু খুড়ো আদালতে গিযেছিল সেদিন, অথচ খববটি আমায দেয়নি।"

সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। সীতাপতিবাবুর বৈঠকখানায় নাতি-ঠাকুরদাব বৈঠক বসিয়াছিল। নিজে তিনি একটি চৌকির উপর আলোব সুমুখে বসিয়া কাহাকে একখানি চিঠি লিখিতেছিলেন, এবং তাঁহার দৌহিত্র ফটিক, চোখের সুমুখে বর্ণপরিচয়ের বই খুলিয়া সুমুখে আলোব পানে হাঁ করিয়া তাকাইযা ছিল।

লাল ও হলুদ বঙে চিত্র-বিচিত্রিত ছোট একটি ফড়িং উড়িয়া উড়িযা ক্রমাগতই আলোব কাঁচে মাথা ঠুকিতেছে। ফটিকের ইচ্ছা, তাহাকে একবার হাতে কবিয়া ধবে, এবং সেজন্য তাহাব হাত দুইটি অনেকক্ষণ হইতেই নিশ্‌পিশ কবিতেছিল।

বহুক্ষণ চেষ্টার পব সত্যই সে ধরা পড়িল। ফটিক তাহাব বাঁ-হাতেব সুন্দর কচি দুইটি আঙুলেব ডগায অত্যন্ত ভয়ে-ভযে ফড়িংটিকে চাপিযা ধরিয়াই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ধবেছি, এই দেখ দাদু,—ইবে বাবা বে!"

ফড়িং উড়িযা যাইবাব জন্য ছটফট কবিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবুব চিঠি লেখা বন্ধ হইল না। হেঁট মুখে লিখিতে লিখিতে কহিলেন, "ছেড়ে দাও। ছিঃ, ফড়িং ধবে না। ওদের লাগে।"

অত্যন্ত মনোযোগেব সহিত ফড়িংটিকে সে ভালো কবিয়া দেখিতেছিল বলিল, "হ্যাঁ—ওদের লাগে, ওবা যেন মানুষ, ওরা যেন ভাত খায়—বা বে। এব আবাব দুটো চোখ আছে—।"

চোখ দুইটি দেখা তাহাব শেষ হইলে, ফড়িং-সমেত হাতখানি ফটিক তাহার দাদুর মাথার কাছে অত্যন্ত সন্তর্পণে লইয়া গিয়া বলিল, 'দেব ছেড়ে? দিব্যি পাকা পাকা চুল খাবে।"

এই সময সুমুখে হঠাৎ পাযের শব্দ হইতেই ফটিক চাহিয়া দেখিল, তাহার মামা নবীন ঘরে ঢুকিতেছে। ভয়ে ফটিকের হাতের

আঙুল দুইটি আপনা হইতেই আল্‌গা হইয়া গেল, পাকা চুল খাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া ফড়িংটি উড়িয়া পলাইল। ছেলের ক্ষোভের আর অবধি রহিল না; পড়িবার ছলে বর্ণপরিচয়ের পাতায় 'ফ'-এর নীচে ফড়িং-এর ছবিখানি খুঁজিবার জন্য একাগ্র মনোনিবেশ সহকারে তাহাকে পুনরায় মাথা নীচু করিতে হইল।

নবীন ঘরে ঢুকিয়াই নিঃশব্দে একবার দেওয়ালের আলমারি, একবার টেবিল, একবার জানালার উপরের কাগজপত্রগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। দোয়াত, কলম কিম্বা কাগজ-পত্রের প্রয়োজন হইলে এমনি করিয়াই সে এই ঘরে আসিয়া ঢুকে, এবং এমনি নিঃশব্দেই নিজের কাজ সারিয়া চলিয়া যায়!

সীতাপতিবাবু তখনও ঘাড় হেঁট করিয়াই লিখিতে ছিলেন। 'দাদু'র ফড়িং-এর উৎপাত হঠাৎ এত সহজে বন্ধ হইল কেমন করিয়া, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, লিখিতে লিখিতে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন? গেল তো উড়ে?"

ফটিকের কাছ হইতে জবাব আসিল না। কথা কহিল নবীন।

বলিল, "আমাদের নামে নালিশ করেছে।"

সীতাপতিবাবু ফটিকের জবাব না দিবার অর্থ বুঝিলেন। মুখ তুলিয়া কহিলেন "কেন? কে?"

নবীন টেবিলের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, "গণেশ পাঁড়ে। আমরা নাকি লোকজন নিয়ে ওদের মেরে এসেছি সব।"

"করুক, কিচ্ছু হবে না।" বলিয়াই তিনি আবার তাঁহার কাজে মন দিলেন।

নবীন বলিল, "আমাদেরও নালিশ করা উচিত,—চাপ্‌রাশীর হাত

থেকে গরু ছিনিয়ে নিয়েছে বলে।

"উঁ—"

"আমরাও ওর নামে নালিশ করব।"

ঘাড় নাড়িয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁহুঁ; আমাদের আর ও-সব হাঙ্গামায় গিয়ে কাজ নেই।"

নবীন বলিল, "আপনি বুঝছেন না, এমনি করে ওর আস্পর্ধা বেড়ে যাচ্ছে দিন-দিন।"

সীতাপতিবাবু হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন, হাতের কলমটা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বাড়ুক, তোর কি? তোর এত মাথাব্যথা কিসের? নালিশ-মোকর্দমা করা এমনি মুখের কথা কি-না। একটি হতে হতে দশটি হবে—খরচ কত!"

"খরচ তো এসময় কিছু হবেই।"

সীতাপতিবাবুর রাগের মাত্রাটা যেন আরও একটুখানি বাড়িয়া গেল।

"—এঁঃ! হবেই। অমনি বলে দিলেই হল—হবেই! পাজি শূয়োর, গাধা কোথাকার। পাই কোত্থেকে, আমি পাই কোত্থেকে টাকা? দাদা এক পয়সা দেবে না—তা জানিস?

ফটিক অত্যন্ত ভয় পাইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

অতি কষ্টে রাগ সম্বরণ করিয়া নবীনও সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল—

"বেশ তবে তাই হোক। ওর যা-খুশি তাই করুক।"

বই-এর তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সীতাপতিবাবু কহিলেন, "উঁ, দেখে যা। লাটের আদায় হচ্ছে মোট ন-শ টাকা—তাও জোর-জবরদস্তি; আর দাদা লিখেছেন, এই ছাখ—।"

এই বলিযা চিঠির কযেকটি লাইনেব উপব আঙুল দিযা তিনি পড়িলেন, "পত্তনিদারেব বাব-শ টাকা লাট থেকে যে-কোন বকমে আদায কবা চাই। আদায তোমরা কবতে জান না, আব সেই জন্যেই বছব-বছব তিন-শটি কবে টাকা আমায় লোকসান দিতে হয।"

চিঠিখানি পুনবায যথাস্থানে বাখিয়া দিযা তিনি বলিতে লাগিলেন, "এব চেযে আদায় আবাব কেমন কবে কবতে পাবে মানুষে? কোন্ প্রেজা উচ্ছেদ কবব? কাকে মাব-ধোব কবব গিযে? যাব যা খুশি তাই করুক,—যে মবে মরুক—।"

মুখ তুলিয়া চাহিযা দেখিলেন, নবীন চলিযা গেছে।

মনোহব বাগ্দি সেদিন আবাব তাহাব স্ত্রীকে সঙ্গে কবিযা ধবিযা আনিল।

স্ত্রী কিছুতেই আসিতে চায না।

মনোহব বলে, "সেটি হচ্ছে না বাবা, বাবে-বাবে কেবলই ফাঁকি দিচ্ছ তুমি।"

এই বলিযা সে পথেব অন্ধকাবে জমিদাবেব দালান বাড়ীটাব দিকে তাকাইযা বলে, "বাবুদেব ওই চিলকোঠায তালা-চাবি মেবে আটকে বাখা হবে, দেখি, এবাব কেমন করে পালাও।"

গববী তাহাব শক্ত হাতখানা ছাড়াইবার চেষ্টা কবে।

চুড়ি-পরা নবম হাতখানা মুচড়াইযা ফেলিতে মনোহবেব বেশিক্ষণ সময় লাগে না, ধীবে-ধীরে একবার পিছনেব দিকে ঘুবাইযা দিতেই যন্ত্রণায অস্থিব হইযা গরবী তাহাব পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে।

কিন্তু এত কবিযাও মনোহর তাহাকে তাহাব ঘরে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। বছর খানেক তাহাদেব বিবাহ হইযাছে, মাঝে একটা

ছেলে হইয়াও নাকি মরিয়া গেছে;—গবৰী বলে, "তুই আবাব কাউকে শাঙা কর্ উনোন-মুখো, আমি তোব ঘবে থাকব না।"

এবং সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই সে পালায।

স্কুলের একটি ঘবেব ভিতব আলো জ্বলিতেছিল। ভেজানো-দরজাটি ধীবে-ধীরে ঠেলিতেই মনোহব দেখিল, নবীন একটি চেয়াবেব উপর জড়সড় হইযা চুপ কবিযা বসিয়া আছেন, টেবিলের একপাশে নামানো লণ্ঠনেব পলিতাটি খাটো কবিযা দেওযা হয নাই,—কালি পড়িযা কাঁচটা অন্ধকাব হইযা গেছে।

মনোহব বলিল, "এই যে হুজুব! বেটিকে আজ আবাব ধবে এনেছি। সে কি এখানে আজ্ঞে,—উ—ই সেই ভালুক-মাবাব পুল থেকে—"

বৎসবেব মধ্যে বহুবাব এই মোকর্দমাটি তাহাব হাতে আসে।

মুখ ফিবাইযা নবীন বলিল, "তবে আব ভাবনা কি আমাব। কেতাত্ত কবে দিলেন আব-কি।—যা বাবাব কাছে যা, আমাব কাছে কী জন্যে এসেছিস মবতে?"

"উনিই যে পাঠিযে দিলেন বাবু। বস হাবামজাদী বস এইখানে!"

গববীব হাতখানা সে আব-এক প্যাঁচ ঘুবাইযা দিয়া চৌকাঠেব বাহিবে তাহাকে জোর কবিযা বসাইযা দিল।

নবীন আর কোনও কথা বলিল না, সুমুখে দেওযালে-টাঙানো জ্যামিতিব ত্রিভুজ-আঁকা ছেলেদেব ব্লাক-বোর্ডটাব দিকে একদৃষ্টে চাহিযা বহিল।

মনোহব বলিল, "মাগীব শযতানী বুদ্ধি দেখেছেন বাবু? এই দেখুন—···তোমাব পেটে এত বুদ্ধি বাবা!" বলিয়াই সে চট্ কবিযা একবার গববীর মুখেব পানে তাকাইয়া লইল।

নবীন তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইতেই মাটিব একটা মালসা ঘবের

মেঝের উপর নামাইয়া দিয়া মনোহর বলিল, "কাপড়ের একটি বিড়ে পাকিয়ে এইটি ও চড়িয়ে নেয় মাথায়—এর ওপরে আগুন থাকে, আর ওর আঁচলে থাকে খানিকটে ধুনো। অন্ধকারে বেরাস্তা ধরে পথ চলে, আর মাঝে-মাঝে এক মুঠো করে ধুনো ওই আগুনে ছিটিয়ে দেয়,—দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার খানিক পরে নিবে যায়, আবার ছিটোয়, আবার জ্বলে, আবার নেবে,—লোকে ভাবে, শাঁকচিন্নি পেত্তা-টেত্তা হবে বুঝি। ভয়ে কেউ আর ও-পথ মাড়ায় না,—দিব্যি নিশ্চিন্ত আপনার সিধা চলে যায়। শুনুন, একবার ওর বিদ্যেটি শুনুন হুজুর! তাই তো বলি,—এই গেল, এই গেল, ধর্, ধর্ ধর্—ছুট্‌লাম পিছু-পিছু, বাস্ আর নেই।"

নবীন বলিল, "ওকে ছেড়ে দে—ও যেখানে খুশি চলে যাক।"

সেই সামান্য আলোকেই দেখা গেল গবরীর চোখ দুটো আশায়, আনন্দে হঠাৎ একটুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মনোহর বলিল, "ছেড়ে দেব? বিয়ে-করা ইয়ে ছেড়ে দেব কি আজ্ঞে? না আজ্ঞে। তা আমি—ওকে তো আমি মাগ্‌না আনিনি—বিয়ে করে এনেছি হুজুর।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নবীন বলিল, "এনেও তো পারিসনি রাখতে,—ও থাকবে না।"

"থাকবে না কি হুজুর? আলবাৎ থাকবে। বিয়ে করেছে—ওর বাপ থাকবে।"

নবীন রাগিয়া উঠিল।

"তবে আবার আমার কাছে কী জন্যে এসেছিস হারামজাদা? তাই রাখ্‌গে যা,—যেমন করে পারিস্ ধরে রাখ্‌গে।"

ঘাড় নাড়িয়া মনোহর বলিল, "সেই হুকুমটি আমি চাইছি হুজুর!

ধরে আমি ঠিক রাখবই। আচ্ছাটি করে বেঁধে আমি ওকে ঘরে পুরে রাখ্‌ব সারাদিন,—দেখি কেমন করে পালায়। আর—আচ্ছাটি করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত······সেই হুকুমটিই আমি চাইছি হুজুর,—তখন বলবেন না যে, তুই কেন মেরেছিস হারামজাদা বল্‌!"

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু মনোহর বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "এতেও যদি কোনদিন পালায় হুজুর, সন্ধান করে আমি ঠিক খুঁজে বার করবই। তারপর আমি দেখে নেব—"

এই বলিয়া সে একটা বেফাঁস খারাপ কথা তাহার সেই বিবাহিতা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিল।

নবীন রাগিয়াই ছিল, এইবার তাহার আর সহ্য হইল না, মেঝে হইতে চটিটা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে মনোহরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "যাচ্ছে-তাই আরম্ভ করেছে শূয়ার! বে-যবানী মুখখিস্তি দেখ,—মহতাপ্‌।"

ইস্কুলের অন্ধকার চালায় মহতাপ্‌ কোথায় না জানি বসিয়াছিল, ডাক শুনিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাঁধ্‌। বেঁধে রাখ্‌ এদের ওই খুঁটিতে। দশ টাকা জরিমানা দিক,—দিয়ে উঠে যাক! হারামজাদা, পাজি, শূয়ার, ছোটলোক, চোয়াড! মুখখিস্তি করবার আর জায়গা পাওনি? কিছুতেই ছেড়ো না তুমি মহতাপ্‌!"

নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার মুখ দিয়া তখন আর কথা বাহির হইতেছিল না।

দরজা দিয়া নবীন পার হইয়া যাইবে, মনোহর পা দুইটা তাহার জড়াইয়া ধরিল।

"দোষ করলে ওই মাগী, আর ডণ্ড হল আমার! এ কখনই হুজুর······ও আমাকে লেজে-গোবরে করেছে আজ্ঞে······এই ছটি মাস······আমার কি আর যবান-বেযবান ·····মাথার ঠিক······"

আরও কত-কি সে বলিতে যাইতেছিল, নবীন তাহার পা-দুইটা ছাড়াইয়া লইয়া স্কুলের উঠানে গিয়া নামিল। বলিল, "বেশ, তবে মাগীই দিক! ও-সব ন্যাকামি শুনতে চাই না আমি। নাংটামি করবি অন্য গাঁয়ে গিয়ে—এ গাঁয়ে চলবে না। জরিমানা করেছি যখন—টাকা চাই আমি, টাকা চাই! তুমি ছেড়ো না মহতাপ্, খবরদার বলছি, দশ টাকার এক-পয়সা কমে ছেড়ো না। নষ্টামি করবার আর জায়গা পাওনি শূয়ার?"

মনোহর তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "শুনলি তো? এ-গাঁয়ে ও-সব চলবে না বাছাধন—তোর সেই বাপের ঘরে চলতে পারে।—আর যাবি কখনও? আর যাবি? পালাবি? —বলিয়া সে দাঁত কট্‌মট্ করিয়া গরবীর হাতখানা আর-একবার মুচ্‌ড়াইয়া দিল।

গরবীর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। হেঁট মুখে সে জড়সড় হইয়া বসিয়াই রহিল। চোখ দিয়া তাহার টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, কিন্তু অন্ধকারে তাহা দেখা গেল না।

নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মারছিস কেন, ওকে মারছিস্ কেন হারামজাদা?"

"না মারলে টাকা বেরোয় আজ্ঞে? না মারলে মেয়ে জব্দ হয়?"

মনোহর তাহার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া নবীনের সুমুখে হাত জোড় করিয়া বসিল।

নবীন বলিল, "টাকা কোথা পাবে, ও টাকা কোথা পাবে?

"পাবে। যদি না পায়—হুজুব—" বলিযা মনোহর সেখান হইতে উঠিযা নবীনেব কাছে আসিযা হাত জোড কবিয়া দাঁডাইল। বলিল, "ভাগে-আবাদে চাষ-বাস করে ধান-পানি তো চারিটি পেলাম হুজুব,—সেই কটি বিক্কি-সিক্কি কবে না হয় আমিই দিযে দিলাম ধরুন! কিন্তুক, বলুক ও,—আমাব ঘবে থাকবে। ধম্মাবতাবেব সাক্ষাতে বলুক যে, খেটে খুটে সে টাকাও আমায শুধবে।…আব সে-ই যে সেই হুকুমটি আমাকে দিন,—ঠেঙ্গাব চোটে বাঁদব নাচাতে পারি আজ্ঞে,—ও তো কোন্ ছাব। ও তো মেয়েমান্নুষ। কতটুকুই-বা ওর 'জিউ'।"

"যা খুশি তাই কর্গে—মব্ বাঁচ্, কিছু জানিনে আমি। জবিমানাব টাকা আমাব ফেলে দিয়ে তাবপব উঠে যা।"

বলিতে বলিতে নবীন পিছন ফিবিয়া স্কুলেব আব-একটা ঘবেব চালায গিযা উঠিল।

মনোহব বলিল, "শুনলি তো? হুজুব কি বললেন শুনলি তো গরব?"

মহতাপ্ তখনও তাহাদেব আগলাইযা দাঁড়াইযাছিল, বাবু চলিয়া যাইতেই তাহাব একটুখানি সাহস বাডিল; রুক্ষ কর্কশ ভাষায় মনোহবকে জানাইযা দিল যে, জবিমানাব টাকা তাহার তৎক্ষণাৎ চাই-ই, এমন কি, এই শীতে যদি তাহাকে আব মিনিট-খানেক দাঁডাইয়া থাকিতে হয তাহা হইলে তাহাকেও কিছু লাগিয়া যাইবে।

মনোহর তাহাব মুখেব দিকে তাকাইয়া বলিল, "এই যে মহাদেব-সাযেব, সেই কথাই তো বাবা…আচ্ছা তুমিই ওকে বেশ কবে বুঝিযে-সুজিযে বল না ভাই।"

স্কুলের একটা কুঠুরির ভিতব খিল বন্ধ করিযা হেডপণ্ডিত মহাশযেব পাশা খেলা চলিতেছিল।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিযা নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "কটা বাজ্‌লো পণ্ডিত-মশাই ?"

নর্ম্যাল-পাশ এই বাংলা পণ্ডিতটি বিদেশী মানুষ। মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনা দিযা তাহাকে এখানে আনিতে হইযাছে। স্কুল ঘরেই বাত্রিবাস করেন, পেসন্ন-বুড়িব ঘবে অভ্যাগত হিসাবে পয়সা দিযা দিনে খাইয়া আসেন, রাত্রিটা দোকানেব মুড়ি-মুডকিব উপবই চলে।

নবীনেব গলাব আওযাজ পাইবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় দবজাটা তাডাতাড়ি খুলিযা দিয়া দেওযালে-টাঙানো জাপানী ক্লকটার ইংবেজি অঙ্কেব অক্ষবগুলা মনে-মনে গুনিতে আবম্ভ কবিলেন।

হারু লাএক ইহাবই মধ্যে ফুলকপিটি ঘবে বাখিযা আসিযা কখন যে পণ্ডিতেব সঙ্গে পাশায় মাতিযাছিল কে জানে।

পাশা খেলা ফেলিয়া সে তাডাতাড়ি বাহিবে উঠিযা আসিল।

ঘড়ি দেখিযাই নবীন চলিযা যাইতেছিল, হারু লাএক তাহাব পিছনে পিছনে অন্ধকার উঠানেব মধ্যে গিযা বলিল, "শোন বাবাজি,— একটা কথা আছে।"

"কি ?" বলিযা নবীন ফিরিযা দাঁড়াইল।

লাএক বলিল, "ঠিক! যা ভেবেছিলাম তাই।"

বলিয়াই সে একবাব অন্ধকার উঠানের এদিক-ওদিক তাকাইযা দেখিতে গিয়া দূবে মনোহব-গববীব উপব নজব পডিতেই বলিযা উঠিল, "ওবা কে ?"

পাশা খেলাব ঝোঁকে এতক্ষণ কিছুই তাহাবা টেব পায নাই।

নবীন বলিল, "কেউ নয়। বলুন—!"

লাএক একটুখানি কাছে সরিযা গিয়া চুপিচুপি কহিল, "গণেশ তলে তলে খবরটি ঠিক রেখেছে যে আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম। বাড়ী যাচ্ছি,—গণেশের দরজাটা কোনরকমে পেবালাম! তাবপব, যেমনি কামারশালের কাছাকাছি আসা, বুঝলে কিনা—অমনি টের পেলাম, কে-একটা লোক অন্ধকারে সড়াচ্ করে ঢুকে পডলো—পাঁড়েদের সেই বেলগাছওযালা পড়ো-বাড়ীটায। লোকটাব হাতে একটা লাঠি ছিল। বুঝলে কিনা? ডাকলাম—কে! বাস্! সব চুপ চাপ্! আব কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভয হল। অন্ধকারে ওই অশ্বথ্-গাছটাব আড়ালে গিযা দাঁড়ালাম। দেখি,—ঠিক! ওবাই দু বাপ্-বেটা। অনুমানে বোধ হল যেন আমার কথাই হচ্ছে। ভাবলাম, বলি, যাই—আমাদেব বাবাজিকে একবাব বলি গিযে। বুঝতাছ? বোজই তো আমাকে অন্ধকাবেই যাওযা-আসা কবতে হয,—তাই ভাবছি,—বেটাবা যদি আমাকে শেষকালে—"

এতগুলো কথা একটানে বলিতে গিযা লাএক যেন হাঁপাইয়া পড়িল।

নবীন বলিল, "কি কবতে হবে আমায? আমি নিজে দাঁড়িযে দিয়ে আসব?"

কথাটাব অর্থ লাএক ঠিক বুঝিতে পাবিল না, বলিল, "উঁহুঁ, হট্ করে অমন সাহসটি কোনদিন কবো না বাবাজি! বাগটা যেন তোমাব আর আমাব উপবেই একটুখানি বেশি বলে মনে হয।"

এই বলিযা হারু লাএক অন্ধকাবে আব-একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল, তাহাব পব আবাব বলিতে আরম্ভ কবিল, "তুমি একটুখানি সাবধানে থেকো বাবাজি,...আমায় দাঁড়িয়ে দিয়ে আসবাব কথা বলছিলে, কিন্তু এ তো আর এক-আধদিনের মামলা নয় বাবাজি—বার মাস ত্রিশটি দিন যে আমায় এখানে আসতে হয় বাপ। দিনান্তে

তোমাদের খবরটি একবার করে না নিলে কেমন যেন কিছুই আমার ভালো লাগে না।—তোমার একটা লোকজন—সেই যে মহাদূত না কে,—সেই তাকেই যদি একবার···বুঝ্‌তাল্লে?"

বুঝতে নবীন সবই পারিতেছিল। ভয় সে অন্ধকারে চিরকালই পায়। নবীন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া লাএক আবার বলিয়া উঠিল, রোজ এই রাত নয়টার সময়—এইখানেই, এই আমাদের পণ্ডিত-মহাশয়ের ঘরে···জ্যোৎস্না রাত হলে আর ঘর পর্যন্ত যেতে হবে না, অশ্বথ-তলা পর্যন্ত গেলেই বুঝলে কিনা বাবাজি, বলে দিও তাহলে মহাদূতকে।"

নবীন বলিল, "তার চেয়ে অন্ধকারে আপনি বেরোবেন না লাএক মশাই, আপনাকে রোজ দাঁড়িয়ে দেবার মত লোকজন এখনও আমার এত সস্তা হয়নি বুঝলেন?"

হারু লাএক একেবারে যেন আকাশ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, তাও তো ঠিক, সে কথাও সত্যি, কাজ কি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে, হ্যাঁ, দরকারই-বা কি···না কি বল বাবাজি?"

কিন্তু বাবাজি তখন অনেক দূরে।

অতি তুচ্ছ সংসারের একটি ঘটনা লইয়া ঝগড়া বাধে এমন প্রায় রোজই।

বৌ বলে, "ভাতে হাত বাড়াবার সময় শুয়ে হাত বাড়িও। কানা হও, কানা হও, দুটো চক্ষের মাথা খাও।"

ঠাকুরঝি বলে "আ —। তাও যদি না কিল দুমা দুম! কেন, তুমি কানা হও না বৌ? আমরা ভাই-এর বিয়ে দিই।'

নবীনেব বৌ বলিল, "তোমাকে তো বলিনি ঠাকুরঝি, যাকে বলছি তাকে বলছি।"

বড মেয়েটা কাছে ছিল না, কোলেরটাব বযস বছব আডাই। তাহারই একটা হাতেব নোলা ধবিয়া টানিতে টানিতে বান্নাঘরেব দিকে এই বলিযা সে চলিযা গেল যে, মেযেব ছেলেই 'সগ্‌গো' দেবে, আর ছেলেব মেয়ে যেন কুডিযে-পাওযা। তাই মেযেব দুধ রোজ-রোজ বেড়ালে খায। চোখেব মাথা খেযে কানা হযেছে সব,—কেউ আব দেখতে পায না।

কিন্তু শ্বাশুডীব কানে টনক বাজিল।

নূতন বাঁধুনীটি কোন কাজেব নয। যাহাকে কম কবিয়া দেওযা উচিত, তাহাকেও বেশি দিযা ফেলে,—মাত্রাজ্ঞান তাহার মোটেই নাই। তাহাকেই কযেকটা সৎপবামর্শ দিবার জন্য তিনি বান্নাঘবে ঢুকিযাছিলেন। বৌ-এব কথাটা কানে যাইবামাত্র চট্‌ কবিযা বাহিব হইয়া আসিলেন।

বৌ তাঁহাব ঠিক সামনেই পডিযা গেল। মুখে আব তিনি কোনও কথা বলিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতেব দুইটি আঙুল দিযা বৌ-এর হাড-ওঠা গালেব চামডাটা টানিযা ধবিলেন, এবং অতি সত্বর সুমুখেব আখা-শালে তাহাকে টানিযা আনিয়া জ্বলন্ত একটা চ্যালা কাঠ আখা হইতেই বৌ-এব মুখেব কাছে তুলিয়া ধবিয়া বলিলেন, "দেব ধেবসে"? দেব চোখ দুটো কানা কবে সব্বনাশীব? তোর বাবা কানা হোক, তোব ভাই কানা হোক, তোব সাতগুষ্টি কানা হোক, চোখের মাথা খাক, আমবা কানা হতে যাব কিসেব লেগে হারামজাদী?"

জ্বলন্ত ওই পোডা কাঠটা তাহাব চোখে আসিয়া লাগা কিছুই

বিচিত্র নয় ভাবিয়া বৌ তাড়াতাড়ি তাহার গাল হইতে শ্বাশুড়ীর হাতখানি টানিয়া ছাড়াইয়া দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।

শ্বাশুড়ীও বোধ কবি একটুখানি ভয় পাইয়াই হাতের কাঠটা বৌ-এর গায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

বৌ একটুখানি সবিয়া দাঁড়াইল, কাঠটা তাহাব গায়ে লাগিল না। কিন্তু নখের ঘাযে গালে তখন তাহার বক্ত ঝবিতেছিল। তাহাবই যন্ত্রণাব চোটে বোধ করি বৌ আব চুপ করিয়া রহিল না, সুমুখে কাঁসাব একটা বড ঘটি পডিয়াছিল, তাহাই সে তাহাব শ্বাশুড়িব দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

ঘটিটা তাহাব হাঁটুব এমন জায়গায় গিয়া লাগিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন, ছুটিয়া গিয়া সে সর্বনাশী বৌকে ঘা-কতক বসাইযা দিয়া আসিবেন তাহাবও আব অবসব মিলিল না।

নবীন খাইতে আসিয়া দেখে, মা তাহার রান্নাঘবে রাঁধুনীর কাছে বসিয়া গল্প কবিতেছে। দিদি তাহাব খাবাব ধবিয়া দিল।

দিদি বলিল, "বৌ তো আজ আব-একটু হলেই মাকে দিযেছিল খুন করে।"

প্রতিদিনের মত নবীন গম্ভীবভাবে চুপ কবিয়া খাইতে লাগিল, কোন জবাব দিল না।

দিদি আব একবাব রুটি দিতে আসিয়া কি-একটা কথা যেন তাহাকে বলিতে গেল, কিন্তু নবীনেব ভাব গতিক দেখিযা সেবাব আর তাহার বলা হইল না।

তৎক্ষণাৎ আরও খান-কতক রুটি লইয়া আসিয়া কথাটা বলিবাব জন্য সে উসখুস্ করিতে লাগিল। এবং পুনরায় তাহার থালাব উপব রুটি

দিতে গিয়া তাহা বলিযাও ফেলিল "গয়লা-বৌ-এব ঘর থেকে দুধ আমি আধ সের কিনে আনলাম। বৌ বলে, আমার ছবি লবির ভাগ কেটে নিয়েছিস। ফটিককে বলে কিনা সে মবে যাক, তা নইলে মেযেরা আমাব···উঠ্‌লি যে এবই-মধ্যে ? হযে গেল খাওযা ?"

বোবার কত চুপ করিয়া নবীন আঁচাইবার জন্য উঠিয়া গেল।

দূব হইতে মা বলিল, "ওবও যে মতিচ্ছন্ন ধবেছে দেখছি।"

দিদি তাহার পবিত্যক্ত থালাটাব উপব ঝুঁকিযা পডিযা বলিল, "একটি রুটি খেয়েছে মোটে । ফটিক ঘুমলো নাকি ?"

অন্ধকাব গভীব বাত্রে নবীনেব ছোট মেযেটা কাঁদিযা উঠিল।

নবীনেব ঘুম ভাঙিযা গেল। বলিল, "কাঁদিও না বলছি, চুপ কবাও, নইলে খুন কবে ফেলব।"

"কাদছে তো আমি কি কবব ? কাঁদিসনে হতভাগী, কাঁদিস নে। বলিযা বৌ তাহাব পিঠেব উপব ভিটু কবিযা এক চড মাবিয়া তাহাকে আবও কাঁদাইযা দিল।

নবীন উঠিল। সুমুখেব দবজাটা খুলিযা সিঁডি দিযা সে ছাতে চলিযা গেল।

প্রভাত হইতে আব বেশি বিলম্ব নাই। অত্যন্ত শীত কবিতেছিল। দূরে স্টেশনেব আলো জ্বলিতেছে।

নবীন অত্যন্ত ত্রস্তপদে খোলা ছাতেব উপব পাযচারি কবিতে লাগিল। মাথাব ভিতবে কিসেব যেন একটা ভযংকর অস্বস্তি বোধ হইতেছিল।

গরুব গলাব ঘণ্টাব শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গাঁয়েব পাশে, রাঙামাটিব পাকা বাস্তাব উপব দিয়া ব্যাপারীদের বোঝাই-গাডীগুলা বোধ কবি শহরে চলিয়াছে।

চিল-কোঠার পাশে নবীন তাহার আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া জড়সড হইয়া চুপ করিযা বসিল। গাঁযের কযেকটি খড়ো-ঘরের চাল ছাড়া আবছা-অন্ধকারে দূরের আর-কিছুই তাহার নজরে পড়িল না।

নবীনের কাছে বাখহরি-হরেকিষ্টর আসা-যাওযা আজকাল একটুখানি ঘন-ঘনই হইযা উঠিযাছে।

বাখহরির মাথার ঘা শুকাইযাছে, কিন্তু কাঁচা রক্তের দাগ-লাগানো সাদা কাপড়ের ফেটিটি সে এখনও মাথা হইতে নামায নাই।

সেদিনও সে নবীনের কাছ হইতে উঠিযা যাইবার সময মাথার কাপড়টা বেশ ভালো করিযা বসাইযা লইযা বলিল, "নালিশ-মোকর্দমা আমাদের যা-কিছু করা—সবই ওই তোমার ভরসায ভাযা! ধরে-বেঁধে আদালতে সেদিন তুমি আমায পাঠালে তাই,—তা-নইলে আমাদের আর কী এমন সাধ্যি আছে? যে-রকম দেখছি, তাতে তো বেশ সুবিধা হবে বলে আর গোটাকতক সাক্ষী, গোটা-চারের কম নয,—বেশ চোখোলো গোছের। তাও পারি কিন্তু টাকা পযসার এমনি টানাটানি—বলেছি তো ভাযা—আমাদের আর এমন কি সাধ্যি আছে—"

হরেকিষ্ট হাতজোড় করিযা বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকা কিছু খরচ না করতে পারলে বেটাকে হেস্তনেস্ত কিছু—কিন্তু হোক আর নাই হোক, এই আমি বলে রাখছি হুজুর, বেটাকে ফাঁকে যদি কোনদিন পাই তো ওর মাথাটি আমি এই দাঁত দিযে চিবিযে—"

গ্রামের পুরোহিত পুত্র চণ্ডী ভট্‌চাজ্‌কে সুমুখে আসিযা দাঁড়াইতে দেখিয়া দাঁত তাহার বাহির হইয়াই রহিল।

নবীন বলিল, "এস তোমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

"আসি আমরা।" বলিয়া হরেকিষ্ট ও রাথহরি উঠিয়া গেল।

জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের অধিকাংশ যজমান এই চণ্ডী ভট্‌চাজের। পিতা তাহার সম্প্রতি মারা গিয়াছেন, কাজেই চণ্ডীকেই এখন সব করিতে হয়। বাপের মস্ত ভুঁড়ি ছিল, চণ্ডী ভাবে, তাহারও বুঝি ভুঁড়ি হইতেছে, এবং সেইজন্য ঠিক সে তাহার বাপের মত খাটো গামছা পরিয়া হরদম ঘুরিয়া বেড়ায়; লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি খুব খানিকটা হড়হড় করিয়া যা-তা বকিয়া যাইতেন,—চণ্ডীও ঠিক তেমনিভাবে কথা কহিবার চেষ্টা করে। মাথায় এক মাথা চুল, বেঁটে-গোছের কালো চেহারা, গায়ে একটা পাঁশুটে রঙের সুতির কাপড় জড়ানো, ধুতির পরিবর্তে নীচে সেই খাটো গামছা। শীত একটুখানি বেশি পড়ায় দিন-কতক সে তাহার ছোট ভাই-এর জুতা ও লাল-রঙের ছেঁড়া মোজা দুইটা পরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সম্প্রতি পায়ে ফোস্কা পড়ায় সেগুলা সে পরিত্যাগ করিয়াছে। দাঁত সে কখনও মাজে না, তাহার চব্বিশ ঘণ্টা পান-দোক্তা চিবাইয়া দাঁতের উপর চমৎকার কালো ছাপ পড়িয়াছে। মুখের কাছে মুখ লইয়া কথা কহিতে আসিলে সে-সম্বন্ধে কেহ যদি কোনও মন্তব্য প্রকাশ করে,—চণ্ডী তৎক্ষণাৎ তাহাকে জবাব দেয়, "শাস্ত্রে আমাদের চত্বারিংশৎ প্রকার দন্তধাবন প্রণালী আছে, তার মধ্যে সকালে উঠে পূবমুখো দাঁড়িয়ে পনের বার কুল্‌কুচু করা—একটা। আমি তাই করি। আমার দন্ত-হাবিশ আছে।...তোমার ও গরু জোড়াটার দাম কত হে?" এমনি-সব অবান্তর প্রশ্ন করিয়া কথাটাকে সে চট্ করিয়া পাল্টাইয়া দেয়।

মাঝে মাঝে তাহার গাল ফোলে, মাড়ি ফুলিয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনা হয়, এবং সেই অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাস-খানেক

আগে সে কোন্ এক কাবুলিওয়ালাব কাছ হইতে আগামী বৎসর পয়সা দিবে বলিয়া একটি বাঁদব-টুপি কিনিয়াছে। সেদিন সে সেটি পবিয়াই আসিযাছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা আবাব কি জন্যে কিনলে ভট্‌চাজ্?

সে কথাব কোন জবাব না দিয়াই চণ্ডী ভট্‌চাজ্ কহিল, "চশমা একটি কত্‌দিন থেকে চাইছি—তুমি খুব দিলে যা-হোক্। ইস্টিশানে সেদিন হাবমনির দোকানে দেখে এলাম, তেমনিই একটা দাও না হয কিনে! ব্যাপারটা খুঁজে পাচ্ছি না,—তবে আব চাইছি কেন হে?"

"বেশ কবছ। কিন্তু শোনো, গণেশ পাঁডেব যজমান ঘবটি তোমায ছাডতে হবে ভট্‌চাজ।"

জবাবেব অপেক্ষায নবীন তাহাব মুখেব পানে তাকাইয়া বহিল।

"ও তো এক বকম ছেডেই দেওযা ধব। ন-মাস ছ-মাস বাদে এক-আধটা কাজকর্ম,—পাওনা তো ভাবি। ভারি তো পাওনা! হ্যা!"—

কিন্তু কথা বলিবাব সঙ্গে-সঙ্গে চণ্ডী ভট্‌চাজেব মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইযা গেল। বলিল, "তবে যদি আক্রমণ-টাক্রমণ করে কোনদিন? যদি আমায় ধবে মাবে? ও-বেটাকে তো বিশ্বেস নেই—"

নবীন বলিল, "খাবে—মাব খাবে। তা আমি কি কবতে পাবি? আমি কি কবব তাব?"

এই বলিয়া একটুখানি থামিযা ভট্‌চাজেব শুকনো টুপি-পবা মুখখানিব দিকে তাকাইযা সে আবাব কহিল, "আব না হয় আমাদেব ঘরটাই ছেড়ে দাও, মাব খাওযাব ভয-ভাবনা আব থাকবে না।"

কথাটা বোধ করি ভট্‌চাজেব মনঃপূত হইল না; প্রত্যুত্তরে ঈষৎ হাসিল মাত্র। অনুমানে বোধ হইল তাহাব মনোভাব এই যে,

জমিদার-যজমানের ঘরে মার খাইবার ভয়-ভাবনা থাকে তো থাকুক! যে গরু দুধ দেয়, সে যদি পা ছোঁড়ে তো ছুড়ুক······

হাসিটা নবীনের ভালো লাগিল না। বয়সে তাহার চেয়ে সে বেশি বড় নয়,—মাঝে-মাঝে ইয়াকি ফষ্টি-নষ্টি করে ; কিন্তু এ সময় সে-সব ভালো লাগে না।

কাজেই কথার গুরুত্বটা নবীন তাহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য জোরে একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "ইয়ার্কি-তামাসা পেয়ে গেছ না কি? হাসছ যে? হাসছ যে?

চণ্ডী ভট্‌চাজের মুখের হাসিটি কালো মেঘে একবার মাত্র বিদ্যুতের মত চমক হানিয়া, গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে সহসা মিলাইয়া গেল। শীতের সকালেও, কপালে তাহার বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল। মুখখানা সে দেখিতে দেখিতে কাঁদুনে ছেলের মত তৎক্ষণাৎ কেমন করিয়া ফেলিল, সে এক দেখিবার মত বস্তু। বলিল, "হাসব কেন নবীন,—হাসিনি। মরে মরে—চোর যে, সে দশ-ঘর ডুবিয়েই মরে। ধীরেন-কাকা যে কাণ্ডটি করে রেখে গেল—বেঁচে থাকলে আমি তার মাথার ওপর গুণে গুণে দশটি জুতো বসিয়ে দিতাম।"

সে কথা সত্য। ধীরেন ভট্‌চাজ্ তাহারই জ্ঞাতিসম্পর্কে কাকা ছিল। সম্প্রতি সে সিউড়ীতে হোটেল করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে। কিন্তু যে কাণ্ডটি সে করিয়া গেছে, তাহা স্মরণ-যোগ্য, এবং সেজন্য চণ্ডী ভট্‌চাজের রাগ হইবারই কথা।

ধীরেন ছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। টাকা দিয়া ছেলেকে বিবাহ করিতে হয়, অভিবাবকও কেহ ছিল না, কাজেই একটি বউ আনিয়া ঘরকন্না করিবার সাধ আর বেচারির মিটিল না, এবং ইহার জন্য তাহার

মনস্তাপেরও আর অবধি ছিল না। ঝড়ো-কাকের মত যেখানে সেখানে ঘুরিযা বেড়াইত—গ্রামে সে প্রায়ই বাস করিত না। কখনো শোনা যাইত, কাছেই কোন কয়লা-কুঠিতে সে রীতিমত কেরানীর কাজ করিতেছে, আবার কখনও খবর আসিত কুলটির বাজারে একটা ময়রার দোকানে সে সন্দেশ বেচিতেছে। আবার হযতো একদিন দেখিতে-না-দেখিতে গ্রামে আসিযা হাজির ! গাযে গরম জামা দামী আলোযান পাযে বুট-জুতা মাথায একটা লাল সিল্কের রঙিন রুমাল বাঁধা। কিন্তু কথা নাই বার্তা নাই গ্রামে ঢুকিয়াই সে একেবারে বসিত গিয়া ভৈরব-স্যাকরার জুযার আড্ডায! তেপাতি তাসের জুয়া খেলা চলে, প্রথম প্রথম দু-চার টাকা পায মদ খায ফুর্তি চলে—আবার দিন-কতক পরে সর্বস্ব খোযাইযা ফতুর হইযা মাথায হাত দিযা বসে—জুতা যায, আলোয়ান বন্ধক পড়ে, গাযের জামাটাও খুলিতে হয—পরনের মিহি ধুতিখানাও তখন মযলা হইয়া যায। তাহাই পরিযা কম দামী গাঁযের তাঁতি-ঘরের একটা মোটা কাপড গাযে জড়াইযা আবার কোন্ দিন সকলের অসাক্ষাতেই গ্রাম হইতে উধাও হয।

কিন্তু এই মরিবার কিছু দিন পূর্বে গ্রাম ছাড়িযা সে আর কিছুতেই যেন যাইতে চাহিল না। কিছু জমি জমা ছিল—দেবোত্তর জমি এবং কুলদেবতা কৃষ্ণ-রাধিকার নিত্য-সেবার কিছু অংশ। ধীরেনের অবর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র চণ্ডীই তাহার সেবা চালাইত, জমির ধান-চাল গুলিও সে ভোগ করিতেছিল।

ধীরেন বলিল, "বর্ধমানে হোটেল খুলব মনে করেছি। জমি তুই আমাকে ছেড়ে দে চণ্ডী বিক্রি করে দেব।"

চণ্ডী ছাড়িতে চাহিল না। বলিল, "মাইরি আর কি! জমিতে সার-

গোবর দিলাম, খরচ-খরচা করলাম, ঠাকুর সেবা চালালাম এত্ দিন,—উপকাব করলাম কি না,—জমি এবার তুমি বিক্রি করবে বই-কি ! করতে হয়—আমাকেই কর। দিচ্ছি গোটা পঁচিশ-ত্রিশেক—নিয়ে যাও।"

কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশের কাজ নয়। হোটেল খুলিতে টাকার দরকার। ধীরেন বলিল, "তা আবাব দেব না বাপধন ? গুণের ভাই-পো কত তুমি ! তোমাব বাবাও তো আমাব খুব করে গেছেন—একটা বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে যেতে পারেননি।"

চণ্ডী বাঁকিযা বসিল। বলিল, "তাই বলে আমাদেব সাত পুরুষের ঠাকুব-সেবাটি তো তোমার দাযে আমি উঠিযে দিতে পাবি না কাকা—পাবো তো আদায কবে নিও,—জমি আমি ছাড়ব না।"

কিন্তু আদায সে যে-কোন বকমে হোক কবিযা লইল।

নগদ একশ-টি টাকা হাতে হাতে পাইবামাত্র মায় ঠাকুবসেবা সমেত সমস্ত জমিটি সে গণেশ পাঁড়েকে লিখিযা দিযা গ্রাম হইতে সরিয়া পড়িল।

জমি দখল কবিবাব সময় গণেশকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না, জোব-জবরদস্তিব কথা দূবে থাক্, চণ্ডী ভট্‌চাজের তবফ হইতে একটি কথাও কেহ বলিতে আসিল না।

তখন হইতে পাঁচটি দিনেব ঠাকুবসেবা গণেশকেই চালাইতে হয়।

চৈতন বলে, "কেষ্ট-ঠাকুরটা না হয কালো-পাথরেব, কিন্তু রাধিকাটা ডাঁহা পিতলের তৈবী,—ভাবি, তা দশ বারো সেরের এক ছটাক কম নয়। উ-ই অত দূব থেকে দু-হাতে দুটো ঠাকুর বযে আনতে আমি পাবব না বাবা ! তুমিও চল,—হাতাহাতি আলা-পালি করে তুমিও খানিকটা আনবে, আমিও খানিকটা আনব।"

গণেশ বলে, "আমি আনব কি রে বেটা ? রাস্তায় রাস্তায় আমি ঠাকুর বয়ে আনব কি ? তার চেয়ে বরং এক কাজ কর্—ওই রাধিকাটা বাদ দিয়েই আনিস্। কেষ্টকে আনলেই চলবে—বাস্! কেউ শুধোয় ? পট্ করে বলে দিবি—ও-সব মেয়ে-ঠাকুরের পূজো আমরা করি না, আমরা জাত-কমুজ্যে। বুঝলি ? বেটা বুঝলি তো ?"

সেই দিন হইতে ভাবি রাধিকাকে ফেলিয়া হালকা কেষ্টটিকেই চৈতন পূজা করিবার জন্য তাদের ঘরে লইয়া যায়।

পাঁচ দিনের পরের দিন চৈতন বলে, "এইবার আমি মাঠে যাই, না ঠাকুর রাখতে যাই—কোন্ কাজটি করি বল তো ?"

গণেশ বলে "ঠাকুর আবার রাখতে যাবি কিরে বেটা ? যার গরজ সে নিজে এসে আমার ঘর থেকে নিয়ে যাবে। ও কোন্—খায় না পরে ? থাক ওই ঘরের এক কোণে পড়ে থাক বেটা কেষ্ট! আর না হয় দিবি তো দে ওই কুলুঙ্গিতে তুলেই দে না হয়—অন্ধকারে ভঁ্যাট্‌রা ট্যাঁট্‌রা আবার হোঁচট খেয়ে হাত-পা ভাঙায় কেন ?"

তাহাই হয়। ছয়-দিনের দিন দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে কেষ্ট-ঠাকুরটি তোলা থাকেন—চণ্ডী ভট্‌চাজ্ নিজে আসিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া যায়।

ভট্‌চাজ্ সেদিন নবীনের কাছে ইহারই আপত্তি তুলিল। ঘরের ভিতর হাতের কাছে পাইয়া যদি সে তাহাকে মারে চোর বলিয়া যদি সে তাহাকে চালান দেয়।

নবীন বলিল, "পূজো তো তোমাকে বারো মাসই করতে হয়, না তা হয় না ?"

ভট্‌চাজ্ বলিল, "হ্যাঁ তা হয় বই-কি! বাবা তো সেই কথাই বলতেন

পূজো ছাড়িস না বাবা, পূজো করি বলেই লোকে আমাদেরও পায়ে জল দেয়। পূজো কি আব ছাড়াবার জো আছে হে ?"

"তবে আর-কি ! ঠাকুব তো তোমার ঘরে দু-বেলা দু-সের চালের ভাত ওড়ায় না ভট্‌চাজ্—তবে আব তোমাব আপত্তিটা কি ? ঠাকুব ওখানে না-ই বা পাঠালে ? ও পাঁচটা দিনও না হয তুমিই চালিয়ে দাও।"

জবাবেব অপেক্ষায় নবীন তাহাব মুখের পানে তাকাইল।

"ও-সব অনেক ভজোকটো হে! বুঝছ না—ভাই-ভাযাদীর কাণ্ড-কাবখানা—অংশীদাব—মাকে বলব এখনি গিযে বাস্‌ তেবিযা-মেরিয়া কবে উঠবে। সকালে উঠেই ডুব পাড়তে হবে চা-ফা খেতে পাবে না—ওসব অনেক হাঙ্গামা! আচ্ছা দেখি তোমাব বাপকে একবাব শুদিয়ে দেখি—"

নবীন এইবার রুখিযা উঠিল।

"আচ্ছা যাও তবে তাই বাবাব কাছে যাও! তাবপর আমি দেখে নেব—কাজকর্মে কে আমাদেব ডাকে! বাবাই ডাকুন আর যে-ই ডাকুন—যাও!"

সুযোগ পাইলে এই ভট্‌চাজটিকে কেহই ছাড়ে না। মহতাপ্ শিব-দেউলেব পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি ভট্‌চাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "যান্‌ ভটাচাবি-মহাশয, যান্‌ বাড়ী যান্‌।"

হাতটা তাহার ছাড়াইয়া লইযা চণ্ডী ভট্‌চাজ বলিল, "দাঁড়াও হে, কাপড়টা পরতেই দাও না!"

"ঘরে—ঘরে পরবেন—যান্‌—"

মহতাপ্ তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া রাস্তায় নামাইয়া দিল।

ভট্‌চাজ্‌ মুখ তুলিয়া তাহার কোটরগত চক্ষু দুইটি একটুখানি চাড়া দিয়া কহিল, "মারবে নাকি ? মারবে নাকি তুমি ?"

বলিতে বলিতে ভট্‌চাজ্‌ একটুখানি দ্রুত পদেই সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

নবীন ডাকিল, "মহতাপ্‌!"

"হুজুব—"

"টাকা কই ? টাকা ? কালকেব সেই জরিমানাব টাকা ?"

"ন-রুপিযা হুজুব।" বলিয়া মহতাপ তাহাব কাপড়েব ট্যাঁক হইতে টাকা বাহিব কবিতে লাগিল।

"আব-এক টাকা কি হল ? নিজে মেবেছ বুঝি ?"

মহতাপ্‌ তাহাব সম্মতি জানাইযা ঈষৎ হাসিল।

নবীন বলিল, "যাও, এক্ষুনি যাও, যাও জলদি যাও, ওই ন-টাকা দিয়ে এস যাও রাখহরিকে !"

জমির চাষ-আবাদেব জন্য মুনিষ-কৃষাণ গণেশ পাঁড়েব ফি-বছব একটা করিয়া নূতন কবিতে হয়।

বর্ষায় জমি নিড়ান হইতে আরম্ভ করিয়া ধানের গুছিতে যতদিন পর্যন্ত না পাকের বঙ ধরে, ততদিন মাঠের যাবতীয় কাজ তাহাকে দিয়াই সে করাইয়া লয, তাহাব পব, ফসলের ভাগ দিবার আগেই যৎসামান্য একটা ছল খুঁজিযা মাব-ধোব করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়,—পাকা ধান নিজেবাই কাটিযা ঘবে ঢুকায়।

সে-বছর নেপাল মুচির কপালে এই দুর্ভোগের যন্ত্রণাটি লেখা ছিল। বেচারা অত্যন্ত দুর্বল—বড় ভালো মানুষ। সারা-বছরটা এক প্রকার

সে ঘরের খাইয়াই খাটিয়াছে। বছরের শেষে ধান কাটিবার সময়টায় গণেশ তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

মার খাইয়া মনের দুঃখে সে নিজের ঘরে গিয়াই বসিয়াছিল। বাথহবির কাছে খবব পাইয়া মহতাপ্ সেদিন দক্ষিণ-পাড়ার এক-প্রান্তে, বাসক-বোয়ানের জঙ্গলে-ঘেবা মুচিপাড়াব ছোট বস্তিটি হইতে তাহাকে সে ডাকিযা আনিল।

নবীন বলিল, "মাব খেযে যে ঘরে বসেছিলি হাবামজাদা? কেন, থান নেই? আদালত নেই?"

কাঁকর-মাটিব দেওযালেব উপব ঘষিযা দিয়া গণেশ তাহাব পিঠের খানিকটা চামড়া একেবাবে তুলিয়া দিযাছে। যন্ত্রণায় বেচাবা অত্যন্ত অস্থিব হইয়া পডিয়াছিল, অতি কষ্টে পিঠেব মেরুদণ্ডটা সোজা কবিয়া সে সেইখানেই বসিযা পডিল। হাতজোড কবিয়া বলিল, "গরীব লোক হুজুব, খেতে পাই না সম্বচ্ছব খাটলাম চাবটি খাব বলে—"

বলিতে বলিতেই সে ঝব ঝব করিযা কাঁদিয়া ফেলিল।

নবীন বলিল "যাস্ কেন বাপু? জেনে-শুনেও তো যেতে ছাডবি নে। কাঁদিস নে কাঁদিস নে —চুপ কব।"

স্ত্রী তাহাব এই নিতান্ত দুর্বল বোগগ্রস্ত স্বামীটিকে পথেব মাঝে একা ছাড়িযা দিতে পারে নাই।* ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া মুচি-বৌ তখন অদূরে কবিবাজ মহাশযেব ভাঙা-ভিটেব পাশে ছ্যাড়া খেজুব গাছটার তলায় দাঁড়াইযাছিল। নবীনের কথাটা শুনিবামাত্র কি যেন সে বলিতে গেল কিন্তু নেপালের মুখখানির দিকে একবার তাহার দৃষ্টি পডিতেই তাহাবও ঠোঁট দুইটা অভিমানী-মেয়েব মত একবার থর থর করিযা কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, কথা তাহার আর বলা হইল না।

নবীন বলিল, "মহতাপ্! ডাক রাখহরিকে! দিয়ে এসেছ টাকা? ফিরে নিয়ে এস।"

বলিয়াই সে একবার নেপালের দিকে একবার তাহার যুবতী-স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাক্ষী-প্রমাণ আছে? দেখেছে কেউ?"

কিন্তু সেই কঙ্কালসার নেপাল তখন তাহার সর্বদেহের অসহ্য যন্ত্রণায় ঘন-ঘন পিঠ-মোড়া খাইতেছিল, বার-কতক উঁ-আঁ করিল মাত্র, কথাটার জবাব দিতে পারিল না।

জবাব দিল মুচি-বৌ। কোলের ছেলেটাকে নামাইয়া সে তখন স্বামীর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, "খামারের ভেতর ঢুকিয়ে মেরেছেন বাবু। ও দস্যি কি কম বজ্জাত!" নবীন মহতাপের দিকে তাকাইল। বলিল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি হতভাগা? যা— ডাক্ রাখুকে! আর অমনি হাবুকেও —হাবু রায়।"

মুচি-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধিক-পিকে শরীল্ নিয়ে বললাম হতভাগা মিন্‌ষেকে—যাস্‌নি যাস্‌নি, চাষ করতে হবে না এ-বছর। তা সে মরতে-মরতে গেল; বলে খাবি কি?"

নবীন চুপ করিয়া রহিল।

"খেটে-খুটে জ্বরে পড়লো। বললাম আমার এখনও গতর রইছে —তুই বসে থাক। ইস্টিশনের ডাক্তার বললে উ-রোগের চিকিচ্ছে তোরা ছোট-নোক —তোরা পারবিনি করতে। খগেশ্বরের মাদুলিটি এই সেদিন এনে দিলাম বাবু! সেটিও আজ দিয়েছে ছিঁড়ে।"

মাসাবধি কাল হইতে নেপালের গলায় একটি লোহার তৈরী প্রকাণ্ড মাদুলি ঝুলিত। দুশ্চিকিৎস্য ক্ষয়-রোগের সে অক্ষয় কবচটি যে তাহার স্ত্রীর দেওয়া—এতদিনে তাহা বুঝা গেল।

নেপাল তাহার স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল উঠিল, "তুই চুপ কর্ না হারামজাদী!"

কিন্তু কথার ধমক তাহার সহ্য হইল না। যন্ত্রণায় আর-একবার পিঠ-মোড়া দিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেরুদণ্ডটা সোজা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ধমকানি খাইয়াও মুচি-বৌ আজ আব চুপ কবিযা থাকিতে পারিল না। "তুই তো বাঁচবাব জন্যে আসিসনি মিন্ষে, তুই মর্বি মর্বি তা আমি জানি —জানি—জানি খুব জানি খুব জানি।"

বলিতে বলিতে শিব-মন্দিবেব পাথবেব সিঁড়িব উপর না জানি কাহার উপব দুর্জয অভিমানে সে তাহাব কপালটা ঠাই-ঠাই করিয়া জোবে-জোবে ঠুকিতে আবম্ভ কবিল।

এখনি হযতো সেও আবাব আর-একটা বক্তাবক্তি কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে ভাবিযা নবীন তাহাকে একবাব ধমকাইযা দিতে গেল কিন্তু চোখ তুলিযা সেই দিকে চাহিতেই তাহাকে নিষেধ কবিবার মত ভাযা তাহাব কণ্ঠে জোগাইল না যেমন বসিয়াছিল আবাব তেমনি নির্বাক হইযাই সে বসিযা রহিল। গণেশ পাঁড়েব উপব দুর্জয ক্রোধে তাহার সমস্ত শবীবেব তাজা রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ কবিযা ফুটিতে লাগিল চোখ-মুখ নিমেষেই বাঙা হইযা উঠিল।

নবীন আব সেখানে বসিযা থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "বোস্ এইখানে। যাস্‌নে কোথাও।"

ঘরের ভিতব হইতে জামা-জুতা পবিযাই নবীন বাহিব হইয়া আসিল। দেখিল, রাখহবি, হরেকিষ্ট ও হাবু রায়—তিনজনেই তাহার অপেক্ষায় শিব-মন্দিরেব দাওয়ায় উপব বসিয়া আছে।

নবীন বলিল, "এই যে রাখু, দেখেছ নেপালকে কী রকম মেরেছে ?"

"তাই তো দেখছি ভায়া ?" বলিয়া সে একবার নেপালের দিকে তাকাইল।

হরেকিষ্ট বলিল, "নেপালকে নেহাৎ ভালো মানুষ পেয়েছে কিনা! পড়তো আমার পাল্লায়, দেখাতাম বাছাধনকে।"

রাখহবির কাছে একটুখানি আগাইযা গিয়া নবীন বলিল, "দাও টাকা-নটা! তোমার যেদিন দবকার হবে সেদিন আবার দেব।"

টাকা সে সঙ্গেই আনিয়াছিল, ট্যাঁক হইতে ধীবে-ধীবে সেগুলি বাহিব কবিয়া নবীনেব হাতে দিযা বলিল, "তোমাবই ভরসা ভাযা —তা নইলে তো…"

হাবু রায় এতক্ষণ চুপ কবিযা বসিয়া ছিল, এইবাব জিজ্ঞাসা কবিল, "আমায় কি জন্যে ডেকেছিলে দাদাবাবু ?"

"তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

"কত দুব ?

"প্রথমে ডাক্তাবখানায,—দেখেছ, ওব ঘা-টা একবাব দেখেছ ?"

নবীন নেপালেব দিকে একবাব ফিবিযা তাকাইল।

"তাবপর থানায, তাবপব আদালতে।"

হাবু উঠিযা দাঁড়াইল। বলিল, "চলুন। অনুমানে যা এঁচেছিলাম —ঠিকই হল। ক-জন চাই ? চলুন। পথেই সব কথাবার্তা হবে।"

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ঠিক হয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছ নাকি হাবু ? জানলে কেমন কবে ?"

"হাওয়ায় খবর যায় দাদাবাবু, এ-সব খবব আমাদেব কাছে হাওযার মুখে ছোটে।"

হাবু সহাস্যে একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "চল রে চল্‌ নেপা চল্‌! ওঠ্‌ মার তো খেয়ে এলি বেটা খুব এইবার দেখি—।"

হবেকিষ্ট সহসা হাত-জোড় করিয়া নবীনের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি ওকে সঙ্গে নিয়েই—নিজে—আপনি—?"

হাবু বলিল, "এতক্ষণ ধরে তবে আর শুনছিস কিরে আহম্মক?"

হবেকিষ্ট তাহার চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া হেঁট মুখে নবীনের জুতার উপর তৎক্ষণাৎ তাহার হাতখানি ঠেকাইয়া তাহাই একবার নিজের মাথায় বুলাইয়া লইয়া কহিল, "ঠিক! এমনি না হলে কি আর দস্যির দমন হয় আজ্ঞে? এমনি না হলে কি আর জমিদার—।"

মহতাপ্‌কে কাছে ডাকিয়া নবীন কহিল, "বাবা শুধোলে কিচ্ছু বলে কাজ নেই। বলো এমনি কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গেছে। বুঝলে?"

ছেলেটাকে কোলে লইয়া মুচি-বৌ তাহাদের পিছু-পিছু চলিতেছিল, নবীন পিছন ফিরিয়া তাহাকে একবার ধমকাইয়া দিল।

"তুই কেন আসছিস আমাদের পিছু-পিছু? যা বাড়ী যা।"

পশু নাপিতের দরজাটা পার হইয়া নবীন একবার পিছন ফিরিল। মুচি-বৌ তখনও একদৃষ্টে সেই দিক পানে তাকাইয়া আছে।

হাবু বলিল, "মামলাটা আগাগোড়া সাজিয়েই নেওয়া যাক!"

নবীন কি যেন ভাবিতেছিল জবাব দিল না। মনে হইল কথাটা যেন সে শুনিতে পায় নাই।

চলিতে চলিতে আর-একবার সে পিছন ফিরিয়া চাহিল।

কিন্তু সীতাপতিবাবু সে কথা শুনিলেন।

থানার জমাদার-সাহেবকে সেদিন টুপি-পায়জামা পরিয়াই সরকারী কি-একটা কাজে পাশের গাঁয়ে আসিতে হইয়াছিল। সীতাপতিবাবুর সহিত দেখা না কবিয়া তিনি ফিরিতে পারিলেন না। এমন তিনি পথ ভুলিযা প্রায়ই আসেন। হাজাব হোক এ-গাঁযের জমিদারটি বড় ভালোমানুষ, অতিথি-সৎকাবের চক্ষুলজ্জা আছে এই কথাটি সাহেবেব মুখে বহুবার শোনা যায়।

সীতাপতিবাবু তাঁহার সেই ছোট বাগানটিতে নিজেব হাতে কয়েক চারা কপি বসাইযাছিলেন। শীতেব সকালে বৌদ্র উঠিতেই কচি কপির পাতায় ঢাকা দিতে হয। প্রভাতে সেদিন তিনি বাগানে ঢুকিয়াই চুপ কবিযা দাঁডাইযা রহিলেন। ছোট চাবাব সবুজ কচি পাতাগুলির উপর বিন্দু-বিন্দু শিশির জমিযাছে। লেবু-ডালিমেব পাতায়-ফলে প্রভাতেব বঙিন আলো ঝিক্‌মিক্ কবিতেছিল।

বাগানেব মাঝে রক্তজবাব ফুল ফোটে। পুবনো বেলগাছটার পাকা-বেলের সুখ্যাতি আশে-পাশের দু-পাঁচটা গাঁযেব লোকও করে। অসভ্য এই বুডো গাছটাকে কাটিযা ফেলাই উচিত,—বলিয়া দাদা সেদিন তাঁহাকে এক চিঠি লিখিযাছেন। চিঠিটাব জবাব এখনও দেওযা হয নাই। গাছটি বহুকালেব প্রাচীন। ধবিত্রীব সহিত যাহার এই এতকালে ঘনিষ্ঠ পবিচয়,—খেয়ালের ঝোঁকে একটি দিনে তাহাকে শেষ কবিযা দিতে তাঁহাব মন সরে না।

কি বলিয়া যে জবাব দিবেন তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।

হংস অধিকারী সেদিন বলিতেছিলেন যে এই গাছে নাকি অনেক কালের বুড়া এক ব্রহ্মচারী বাস করেন। পবনে তাঁহার গেরুযা বস্ত্র—পাকা পাকা লম্বা দাড়ি! মাঠ হইতে বাড়ী ফিবিতে যেদিন তাঁহাব রাত একটুখানি বেশি হইয়াছিল সেইদিন বুড়া-বেহ্মচাবীর খড়মের চট্‌পটানি তিনি

স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। বাউল ভট্টচাজও সেদিন নাকি তাহাকে চিমটা বাজাইয়া গান গাহিতে গাহিতে আকাশ পথে উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছে!

এবং সেটি নাকি তাঁহাদেব পূর্বপুরুষেব পয়মন্ত গাছ।

সীতাপতিবাবু ঠিক কবিলেন চিঠিব জবাবে দাদাকে তিনি এই প্রত্যক্ষ সত্য কথাটিই লিখিয়া দিবেন। মিথ্যা একটা অজুহাত দেখাইয়া লাভ কি!

লোহার নাল-বাঁধানো সিপাহী-বুটেব তলায কচি একটি কপিব চারাকে মাড়াইয়া দিযা জমাদাব-সাহেব অনেকক্ষণ হইতেই তাঁহাব পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেদিকে সীতাপতিবাবুব নজব পডিতেই কহিলেন, "এই যে! খবব কি?"

জমাদাব-সাহেব কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার কবিলেন।

"আব দেখছেন কি মশাই —কবড্ডায একটা সিঁদ্-চুরি হযে গেছে—চৌকিদাব-বেটারা সব—"

কথাটা তিনি শেষ কবিতে পাইলেন না।

সাহেবের পাযেব দিকে তাকাইবামাত্রই সীতাপতিবাবু হাঁ হাঁ করিয়া তাঁহাকে এক প্রকার ঠেলিযাই ক্ষেত হইতে সবাইয়া দিয়া নিজেও সেখান হইতে চলিযা আসিলেন।

বৈঠকখানাব উপবে উঠিয়া আসিযা বলিলেন, "বলুন। তারপর—খবর কি? বসুন।"

বাবান্দায় চেযারেব উপব বসিয়া পডিয়া জমাদাব সাহেব কহিতে লাগিলেন, "খবব আব কি। এমনি এলাম। বাড়ীব পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি ভাবলাম—বাবুর খববটা একবার নিয়েই যাই।

আপনার বাড়ীতে চা খেয়ে গিয়ে সেদিন আমি বহুৎ সুখ্যাতি করলাম বুঝলেন? ফাইন চা। দার্জিলিং টি কি আপনার কলকাতা থেকেই আসে?"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "না না, ও আমি খাই-টাই না মশাই। বাড়ীর সব ছেলেপুলেগুলো খায় আর এই আপনাদের জন্যেই—এই বাজার থেকে নিয়ে আসা।"

জমাদার-সাহেবের জন্য চা আসিল।

পেয়ালায় চুমুক দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ফাইন। হ্যাঁ বলছিলাম কি আপনারা রাজা-লোক—ও আর কতক্ষণ—দিন-না ও-বেটা পাঁড়েকে একেবারে জন্মের মতন পথ দেখিয়ে—দিন-না। তারপর আমরা দেখে নেব।"

কথাটা তাঁহার বোধ হয় ভালো লাগিল না। ঈষৎ হাসিয়া তিনি কপির চারা ঢাকা দিবার জন্য বাগানে নামিয়া গেলেন।

চা খাইতে খাইতে জমাদার সাহেব আবার কহিলেন, "আপনার ছেলেকেও সেদিন বললাম এই কথা। তাঁর তো এ বিষয়ে খুব উৎসাহ দেখি।"

বাগানের ভিতর সীতাপতিবাবু মাথা হেঁট করিয়া শাল পাতার ঠোঙ্গাগুলি কুড়াইয়া জড়ো করিতে লাগিলেন, প্রত্যুত্তরে অন্যমনস্কের মত আবার ঈষৎ হাসিলেন।

"সেই মুচি বেটার 'কেস্'টা নিয়ে আপনার ছেলে যেদিন গেলেন থানায়, আমিই ছিলাম সেদিন থানার 'ইন-চার্জ'—নিস্পেক্টর্‌বাবু মফস্বলে বেরিয়েছিলেন। ডায়েরিটা খুব খিঁচেই লিখেছি।" এই বলিয়া খুব খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গরম চা-টা তিনি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া একটানে অনেকখানি

গিলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার শুরু করিলেন,—'আদালতের সাক্ষী-সবুদ ওইখান থেকেই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া গেল। আপনার ছেলে বেশ 'ইনটেলিজেণ্ট', বুঝলেন কিনা, বেশ চালাক-চম্বা, বেশ তুখোড, খুব ফডফডে—বুঝলেন কিনা। আপনার ছেলে··· হেঁ হেঁ—"

পেয়ালাটি শেষ কবিয়া তিনি নামাইয়া বাখিলেন। চেয়ার ছাডিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তাহলে আসি—নমস্কাব!"

সীতাপতিবাবু পিছন ফিবিযাই ঘাড নাডিলেন।

"নমস্কার।"

কিন্তু এই জমাদাব-সাহেবটি চলিয়া যাইবার পব তিনি আব চুপ কবিযা থাকিতে পাবিলেন না, তৎক্ষণাৎ নবীনকে ডাকাইয়া খুব একচোট জোবে জোবে চীৎকার কবিতে লাগিলেন।

"শূযোব, উল্লুক, পাজি, ছুঁচো, গাধা—সব মাটি করবি দেখছি তুই, সব লণ্ডভণ্ড কবে ফেলবি তুই! দাদা যদি শুনতে পায এ কথা—। কী দবকাব ছিল তোর নেপা মুচিকে নিয়ে থানা-আদালতে নিজে যাবার?······ও ন্যাংটা ছোটলোকের সঙ্গে গুণ্ডামি কবে কী লাভ হবে তোব শুনি?"

নবীন ধীরে-ধীবে সেখান হইতে সবিয়া পডিল।

নবীন প্রায় অধিকাংশ সময় ঘবের বাহিরেই কাটায়। বাডী ঢোকে মাত্র খাবার প্রয়োজনে।

মা সে দিন দুপুরে তাহাকে শুনাইয়া দিলেন, "ওরা তোর চোদ্দ-পুরুষেব কে, যে ওদেব হয়ে নালিশ মোকর্দমা করে বেড়াচ্ছিস?"

নবীন আধ-খাওয়া করিয়া সেদিনও উঠিয়া গেল।

বৌ তাহার রোজ ভাবে যে কথাটা তাহাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিবে। মেয়েছেলে লইয়া ঘর-সংসার করিতে হইলে পরের দায় নিজের খাড়ে চাপানো ভালো নয়,—সে এক আলাদা কথা……

কিন্তু তাহাদের দেখাশুনা যখন হয়, রাত্রি তখন অনেক। সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া ওঠে। কথা বলিবার অবসর থাকে না। সব দিন হয়তো ভালোও লাগে না।

গাঁয়ের পূব পাড়ায় বাখহবির গোয়ালের পাশে তাহার দাদা বঙ্কিম, নিজের হাতেই ছোট একটি ঘর তৈরী করিয়া লইয়াছিল। সংসারে আস্থা তাহার খুব কম। সর্বাঙ্গে ধবল-কুষ্ঠের দাগ। নিজের বুকের উপর বাঁ হাতখানি এবং হাঁটুর উপর ডান-হাত রাখিয়া ডুগি-তব্‌লার পরিবর্তে শরীরটাকেই বাজাইতে বাজাইতে বাউলের সুরে সে গান গায়—

> "—জপ মন ভোলা!
> ভোলার দয়া চাস যদি কেউ
> সার কর রে গাছের তলা!"

আবার হয়তো তৎক্ষণাৎ সে গানটা থামাইয়া দিয়া মনের আবেগে গাহিয়া উঠে—

> "গাঁজা তোর মহিমা এ কি
> আমি দিন-দুপুরে স্বপন দেখি।"

হরদম গাঁজা খায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে,—আর চব্বিশ ঘণ্টা সেইখানে পড়িয়া থাকে। অপরিচিত কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, নাম—"শ্রী বঙ্কিমানন্দ। ওই আনন্দটুকুই যা-কিছু! দেখ না,—অভয়ানন্দ, পরমানন্দ, —সব সিদ্ধপীঠ লোক বাবা! চুরি করলেই

চোর, ডাকাতি করলেই ডাকাত, হাওয়াগাড়ী চড়লেই বড়লোক, আর না খেতে পেলেই গরীব।"

রাখহরিকে ডাকিবার জন্য হাবুকে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নবীন সেদিন সন্ধ্যায় এইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কলিকায় তামাক সাজিয়া আগুনের সন্ধানে বঙ্কিম এদিক-ওদিক হাতড়াইতেছিল, নবীনকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এস বাবা এস! বস বস!"

নবীন দাঁড়াইয়াই রহিল।

মাথার উপর মাচায় কতকগুলা খড় তোলা ছিল, সেইখান হইতে আঁটি-কয়েক খড় টানিয়া বঙ্কিম পাশের গোয়ালে চলিয়া গেল! কেরোসিনের কুপিটা সেইখানেই জ্বলিতে লাগিল।

গরুতে-বাছুরে ছাগলে-ভেড়ায় বঙ্কিমের হেফাজতে গোয়ালে প্রায় দশটি জানোয়ার গায়ে-গায়ে বাঁধা থাকে।

খড়গুলি পাইয়া অন্ধকারেই তাহারা হুটোপুটি শুরু করিল।

বঙ্কিম ফিরিয়া আসিয়া কেরোসিনের আলোয় খড়ের একটি নুটি জ্বালিয়া কহিল, "বাবু তোমায় ভায়া বলে, আর আমি বলি বাবা।"

এই বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

তারপর হাসি থামিলে আবার বলিল, "তুমিও বাবা, এও বাবা সে-ও বাবা, আর সব-চাইতে বড় বাবা হল গিয়ে—"

সুমুখে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া বঙ্কিম বলিল, "সেই পাগলা-বাবা ভোলানাথ! দুর্জয় বেটার সাহস কিন্তু! ঘর-দোর ছেড়ে-ছুড়ে ছাই-ভস্ম মেখে সন্নোসী হল—ঠিক আমার মতন! বুঝলে নবীন? ওই-বেটাই খাঁটি, আর-সব দেবতা-টেবতা, সব ঝুট!"

হাবু ও রাখহরি দুজনেই আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "কালকাব দিনটা কোনরকমে চালাও রাখহরি,— কোথাও কিছু হল না।"

রাখহরির মুখখানি হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া গেল। বলিল, "তাই তো ভায়া, কাল একটা ভালো উকিল না দিতে পারলে—"

হাবু রায় বলিল, "হরিশ মোক্তারকে বলে এসেছি আমি। উকিলের সে কান কাটে। উকিল চাই না, হরিশবাবুকে দিলেই হবে।"

রাখহরি তাহাব দাদাব সেই ছোট ঘবখানিব উপর উঠিযা গিয়া বলিল, "তারও তো খরচ আছে একটা। আচ্ছা, এস উঠে এস—ভেবে দেখা যাক?

নবীন ঘাড় নাডিযা বলিল, "না, এখানে আব বসব না। এস তুমিই এস।"

বঙ্কিম এক কোণে বসিযা তামাক টানিতে ছিল, বাখহবি বলিল, "কই দে দেখি দশটা টাকা, কাল-পবশু দিয়ে দেব।"

বঙ্কিম আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল, "টাকা কোথা পাব আমি? আমাব ঘর না সংসার, সন্ন্যাসী মানুষ, টাকা কোথায পাব আমি? যার টাকা আছে তাকে বলে বডলোক, আব যাব টাকা নেই,—তাকে বলে গবীব।"

রাখহরি রাগিযা উঠিল।

"রাখ্, তোব ক্ষ্যাপামি বাখ্! দিবি তো দে বলছি দে। নইলে জানিস তো আমাব রাগ,—দেব আগুন লাগিযে পুডিযে মেরে কোন্‌দিন—তাহলেই বুঝবি মজা।"

নবীন ডাকিল, "টাকা ও কোথায় পাবে বাখু? এস তুমি নেমে এস।"

"তা আমি শুনব কেন হে ভায়া? এই খামারে চব্বিশ ঘণ্টা থাকে,—

রাত-বিরেতে কত টাকার ধান বিক্কি করে তা কে দেখতে যায়? সব জানি, আমি সব জানি,—বার কর বলছি টাকা বার কব—তা নইলে তোর উদ্‌ভট্টি সন্ন্যেসীগিরি আমি ঝেড়ে দেব একদিন।"

এই বলিয়া রাখহরি সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

তিনজনে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। রাখহরি বলিল, "আছে ভায়া, এক উপায় আছে। সাধু বেনে এই মরসুমে কিছু করে নিলে। ওকে একবাব চেপে ধবলে কিছু বেরিয়ে আসে,—অন্তত কালকের খবচটা—"

"কি রকম?"

রাখহবি তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, আজকাল এই ধান-কাটার সময সাধু বেনে রোজ অন্তত পনেব-কুড়ি সের ববটি ও বমা কলাই নুন-লঙ্কা দিয়া সিদ্ধ করে এবং সেগুলা মাঠে লইযা গিযা ধান-কাটা মুনিষজনের কাছে বিক্রী কবিয়া আসে;—কমসে কম দশ-বার টাকা সে যেমন হাতে পায না, তেমন তাহাব পরিবর্তে যে-বস্তু সে পায়, আজকালকার 'মাগ্‌গি-গণ্ডার' বাজারে তাহাব দাম অনেক। এমন কি পাকা ধানগুলো সে নিজে বহিয়া আনিতে পাবে না, তাহাব সেই বিধবা মেযেটা মাঠ হইতে প্রকাণ্ড ধানেব বস্তাগুলো মাথায় কবিযা কতবার যে ঘবে রাখিয়া যায় তাহাব কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। এক মাসের জমা-বাবদ জমিদারকে অন্তত কুড়িটা টাকা তাহার দেওয়া উচিত।

"চল।"

রাস্তার ধাবে ছোট একটি খড়ো-ঘরের বাহিরের দিকে দরজা ফুটাইয়া সাধু বেনে তাহার নিতান্ত ছোট-খাটো ঝাল-মসলার দোকানটি চালায়। দোকানের দরজায় তখন কপাট পড়িয়াছে।

হাঁক-ডাক শুনিয়া ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল।

নবীন ধীরে-ধীরে বলিল, "কাজ নেই রাখু, চল। এর কাছে হবে না।" হাবু তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি কহিল, "জরুর হবে দাঁড়ান।"

সাধু নিজেই বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু এমন অসময়ে এই এতগুলি লোককে তাহার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সে একটুখানি ভয় পাইয়া গেল। কালো রঙের শীর্ণ দুর্বল বাঁ-হাতের দুইটি আঙুলের ডগায় ধরিয়া কেরোসিনের যে জ্বলন্ত কুপিটি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেটি সে তাহার চৌকাঠের উপর ধীরে-ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সকলকে একটি একটি প্রণাম করিল; হাত জোড় করিয়া বলিল, "কি হুকুম আজ্ঞে?"

কাঁচা-পাকা গোঁফগুলা তাহার মুখের উপর ঝাপিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু নীচের-পাটির উঁচু দাঁত দুটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্ধকারে সে দুটি ঝক ঝক করিতেছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠে কলাই বেচে পয়সাকড়ি আজকাল নাকি বেশ পাচ্ছ শুনছি—"

সাধুকে শীত একটুখানি বেশি লাগিতেছিল, গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটার উপর কোঁচার খুঁটটা টানিয়া লইয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল, "বেশি আর কোথা আজ্ঞে, বাপ-বেটিতে সারাদিন খাটি,— আনা-আষ্টেক হয় রোজ! পয়সাই তো সব আজ্ঞে, সংসারে পয়সা বিনে আর কী আছে বলুন?

কপালের উঁচু হাড়ের নীচে দুইটা গর্তের ভিতর হইতে নিতান্ত ছোট এবং উজ্জ্বল চোখ দুইটা তাহার সেই কেরোসিনের কুপির আবছা-অন্ধকারেও ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। মনে হইল যেন সে এই দুইটা চোখের দৃষ্টি দিয়া দুনিয়ার একমাত্র পয়সা ছাড়া আর-কিছুই দেখিতে পায় নাই।

রাখহরি বলিল, "জমিদারকে জমা লাগবে সাধু, জমা না দিয়া তুমি কলাই বেচতে পাবে না। বোজ আট-দশ টাকার ধান—এ কি মুখের কথা বাবা ?"

হাবু বলিল, "ধান কেউ নিজের মাঠের দেয় না তা আমি জানি। পরের মাঠেব আঁটি ঝেড়ে তোমাব বস্তা বোঝাই কবে দেয—আব তুমি তাই নিয়ে এস ঘরে। সব চুবি—বাবা সব চুরি।"

কথাটা সত্য। সাধু বেনে বেশ একটুখানি ঘাবড়াইযা গেল। ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মুখে কোনও কথা না বলিযাই সে তাহার ঘবে ঢুকিল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিবিয়া আসিয়া নবীনেব কাছে তাহাব সেই কঙ্কালসাব হাতখানা বাড়াইযা দিয়া বলিল, "ধরুন।"

সাধুর হাতখানা থব থব কবিযা কাঁপিতেছিল, বলিল, "আপনাকে পান খেতে এই যা দিচ্ছি—আজ্ঞে এই……আনা-চাবেক—"

বাখহবি বলিল, "আনা-চাবেক কি বে বেটা? আনা-চারেক কি ?"

হাবু আব কোন কথা বলিবাব অবসব পাইল না।

নবীন চীৎকার কবিযা উঠিল, "হাবামজাদা, পাজি,—চোর কাঁহাকা! চল্—দেখি,—চুবি-করা কত ধান আছে তোব ঘবে, এক্ষুনি চালান দেব থানায়। চল—"

রাখহরি ও হাবুকে লইয়া সুমুখেব খোলা দবজা দিযা হুড়মুড় করিয়া নবীন তাহার ঘবেব ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

সাধুর হাত হইতে কেরোসিনের ডিবেটা এক প্রকার কাড়িয়া লইয়াই রাখহরি সর্বাগ্রে ভিতবের চালার দিকে আগাইয়া গেল।

চালার এক পাশে পাকা ধানের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ দিনে-দিনে জড়ো

হইয়াছে। রাখহরি সেদিন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিল। বলিল, "দেখে যাও হে, দেখে যাও, বেটার কাজ দেখে যাও।"

গাদা হইতে এক মুঠা ধান তুলিয়া লইয়া আলোর কাছে মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে হাবু বলিল, "এ যে বাবা আমারই মাঠের সিঁদুরমুখী ধান। এ যে 'চিন্‌বস্ত' সাধু! তুমি আর যাবে কোথা বাবা?"

রাখহরির আর বিলম্ব সহ্য হইল না। সাধু তখন উঠানের হিমে বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "চল, চৌকিদারের জিম্মে করে দিয়ে আসি তোমাকে চল।"

এতক্ষণে মনে হইল যেন সাধুর বিধবা মেয়েটা পাশের একটি ছোট ঘরের খিল খুলিয়া অন্ধকার চালায় আসিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিল, "রাখু, হাবু, চলে এস তোমরা,—আমি দেখে নেব এর পর।"

তাড়াতাড়ি উঠানটা পার হইয়া সে বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল।

অন্ধকার উঠানের উপর একেবারে হামাগুড়ি দিয়া সাধু তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"দেখে শুনে একটি আধুলি বাবু এই আমি আপনাকে দিচ্ছি পান খেতে—গরীব লোক বাবু, মাপ করুন আপনি…"

পান খাইবার জন্য আর বেশি যে উঠিবে না নবীন তাহা জানিত। পা দুইটা তাহার ছাড়াইয়া লইয়া সে বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখহরি কাছে আসিয়া বলিল, "কি হবে তাহলে ভায়া, কি হবে?"

পথ চলিতে চলিতে নবীন বলিল, "কি হবে তা আমি কি জানি?"

হন হন করিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া গেল।

"এখানে আসাই যে আমার উচিত হয়নি।···এমনি ছ্যাঁচড়ামি করে আমি যার-তার কাছে আদায় করে বেড়াই, আর তুমি বসে বসে মোকর্দমা চালাও। ভাবি যেন আমারই গরজ।··· "

হাবু ও রাখহরি দুজনেই তাহার পিছু-পিছু আসিতেছিল।

নবীন আবার বলিল, "মোকর্দমা তোমার চালাতেই হবে রাখু, তা সে তুমি যেমন করেই চালাও। যাও তুমি যাও, আর এস না, টাকার চেষ্টা দেখগে।"

"তাই দেখি ভায়া" বলিয়া রাখহরি ফিরিল।

হাবুও ফিরিবার জন্য ইতস্তত করিতেছিল।

নবীন তাহাকে সঙ্গে ডাকিয়া লইল! স্যাঁকরাদের ঘরগুলা পার হইয়া আসিয়া নবীন বলিল, "তোমার ভয় নেই হাবু, তোমাকে মোকর্দমা আমি নিজে করিয়েছি। দিন কবে পড়েছে বললে? পরশু নয়?"

হাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ পরশু। কিন্তু আমি ভয় করি না দাদা-বাবু,—আমি সে ছেলেই নই।"

"আচ্ছা, বিনোদ কুলুকে দিয়ে যে দু-নম্বর করিয়েছ, সে দুটোর দিন?"

"তার এখনও অনেক দেরি। পঁচিশে।"

"রতনা বাগ্‌দিকে দিয়ে যেটা করালে, সেটা বুঝি পনেরই? হ্যাঁ ও-সব আমার মনে থাকে না হাবু দু-একদিন আগে থেকে মনে করিয়ে দিও।"

হাবু ঘাড় নাড়িল।

"আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, নেপাল যে অসুখে পড়ল, সে কি সেদিন ওই-ব্যাটার মার খেয়েই, না ও-অসুখ ওর আগে থেকেই ছিল।"

হাবু বলিল, "মার খেয়ে তো নিশ্চয়ই।···অসুখ আবার আগে থেকে থাকে কখনও?"

আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ উঠিতেছিল।

নবীন কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য হাবুর দিকে মুখ ফিরাইতেই সেই ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল তাহার বগলের নীচে কি যেন একটা ঝকঝকে হাতিয়ার লুকানো রহিয়াছে। বলিল, "এ কি? এ কি জন্যে হাবু?"

হাসিতে হাসিতে কাঠের বাঁট-দেওয়া ধারালো ইস্পাতের টাঙ্গিটি সে তাহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া নবীনকে দেখাইল।

"এক এক চোটে দু-দুটো মানুষ।······এ না হলে কি আর বেরোবার জো আছে আজকাল। দুশমন সব আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আপনিও একটা রাখুন, বুঝলেন—"

এত রাত্রে বাক্সের চাবির যে কি প্রয়োজন নবীনের স্ত্রী তাহা বুঝিল। বলিল, "না, চাবি আমি দেব না।"

নবীন বলিল, "অবিশ্বাস করছ?"

স্ত্রী তাঁহার ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, "আ—। কী বিশ্বাসের লোকটি গো,——সাধু স্যাওড়াগাছ!"

নবীন বলিল, "দাও। আবার দেব।"

"হ্যাঁ, তা আবার দেবে না! দিয়েছ যে কত!"

নবীন মিছামিছি একবার বাক্সের কাছে আগাইয়া গেল। স্ত্রী তাহার বাক্সটার উপর একেবারে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং উপুড় হইয়া দুই হাত দিয়া সেটাকে আগলাইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "না—না, না, দেব না, না।······আমায় খুন কর, তারপর নিয়ে যাও, মর, যা খুশি তাই কর।'

নবীন সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া তাহার বিছানায় গিয়া শুইল। বলিল, "বেশ। দেবে না তাই বল, অত কথায় কাজ কি?"

"না, দেব না। পবের জন্যে আমার গায়েব রক্ত দিতে পারব না।"

বাক্স ছাড়িয়া বৌ উঠিযা দাঁড়াইল।

"তুমি আমার হাড়ে হলুদ দেবে, পরের দায়ে আমার সব যাবে—সব যাবে। মা গো মা, এমন লোকও তো কোথাও দেখিনি মা, এব চেয়ে আমায় কেটে কুটে নদীব জলে ভাসিযে কেন দাওনি মা!" বলিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না শুরু করিল।

নবীন আব একটি কথাও বলিল না। ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল কিছুই টেব পাওয়া গেল না।

পবদিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিতেই সর্বপ্রথমেই বৌব নজরে পডিল—তাহার বাক্স খোলা। নবীন কোন্ সময আসিয়া চলিযা গেছে। মেযে দুটা তখনও ঘুমাইতেছিল।

বৌ-এর গায়ের বক্ত জল হইয়া গেল। বুকেব ভিতবটা ঢিপ্ ঢিপ্ কবিতে লাগিল…… .

মাঠের ধান ঘবে আসিল।

পাঁড়েদের সেই জরো-ছেলেটাকে গাঁযেব পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। বছবের এই সমযটায তাহাব জ্বব ছাড়ে। দেবেন-পণ্ডিতের কুলগাছে কুল পাকে। বসন্তের হাওযা বয়……

সে-বৎসর গ্রামেব ভিতর বিস্তব বং-বেরঙের পাখীর আমদানী হইয়াছিল।

'দুগ্‌গো-বাংলা'র পাঠশালাটি বাশু-ভট্‌চাজ্‌ই চালায।

দেবেন-পণ্ডিত বাঁশেব একটা নূতন তীব-ধনুক তৈরী করিয়াছে। উঠানের কুল-তলায় সে সারাদিন বসিয়া থাকে। মাকে বুঝাইয়া বলে, ইস্কুলে যে খবরের কাগজটা আসে, তাহাতেই সে নাকি দেখিয়া

আসিয়াছে, —'পিথিমি'র মধ্যে এ-বছর কুল আর কোথাও হয় নাই,—দেশ-বিদেশ হইতে তাই এত পাখীর আমদানী। আর……

"সব-বেটা কুল খায়……"

কিন্তু মিছাই আসিল। দেশে আর বাছাধনদের ফিরিয়া যাইতে হইবে না। দেবেন বলে, "অর্ধেকের উপর আমি মেরেই ফেলব।"

কানা-কিষ্টুর বাঁজা-গাছটায় ছাড়া, গাঁয়ের প্রায় সব আমগাছেই তখন মুকুল ধরিয়াছে।

এমনি দিনে রাখহরি-হরেকিষ্টর মোকর্দমাটা হঠাৎ ফাঁসিয়া গেল। গণেশ-কিশোরীর কিছুই হইল না।

তাহাদের আনন্দ-আস্ফালনের আর সীমা রহিল না। গণেশ পাঁড়ে যার-তার কাছে গোঁফ চুমরাইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"আরও ক-শালার মাথা ফাটাই তোরা শুধু চেয়ে-চেয়ে ছাখ্।……আমার হবে কচু! আমার হবে ঘণ্টা!……"

নবীনের সর্বাঙ্গ রাগে গুর্ গুর্ করে। বলে, "তাই দেখাই যাক।"

প্রাণের ভয়ে ভীরু দু-একটা গাঁয়ের লোক গণেশের কথায় সায় দেয়। নবীনের কানে সে-কথা আসে। তাহাদের কাছে ডাকিয়া বলে, "ভালো তোদের কস্মিনকালেও হবে না তা জানি। এ-গাঁয়ের বাস তোরা উঠিয়ে দে, কোথাও চলে যা, বেরো আমার জমিদারী থেকে—। দূর হ!"

নবীনের নামে পাল্টা-মোকর্দমা গণেশ কম করে নাই। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের অভাব,—সেটা তাহার বলা-কথা; কারণ, ধর্মাধিকরণের কাছে বহু পূর্বেই সে আর্জি করিয়া রাখিয়াছে যে, জমিদার অত্যাচারী বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালাইয়া মারিয়া ফেলিবে, গ্রামের দরিদ্র প্রজা সে ভয় রাখে।

কিশোরী পাঁড়ে ইস্টিশানের ফটকের চাকরিটি তখনও ছাড়ে নাই। খাবার ছুটি পাইয়া সেদিন সে ঘরে আসিয়াছে, গণেশ বলিল, "দে এবার তুই কিছু টাকা দে। আমি বহুৎ দিলাম। তিন-চার শ গেল আমার।"

"এ তো ভারি মুস্কিলে ফেললি তুই! টাকা আমি পাই কোথা?"

গণেশ বলিল, "ও সব বললে চলবে না—ও-সব বাজে-কথা আমি শুনতে চাই না। মোকর্দমা একা আমার নয—তোর নামেও। টাকা চাই—টাকা দে, টাকা দে।"

পাঁচ-সাতটা মোকর্দমায় আসামী হইয়া এখন আর সরিয়া দাঁড়াইবারও উপায় নাই। কিশোরী পাঁড়ে মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল।

রান্নাঘর হইতে কিশোরীর বৌ-এর ঝনঝনে গলার আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল।

"—ও মাগো! আয় রে বাঘ না গলায় লাগ্। ভাসুরের কথা শুনলে কি হয়। কেনে, উ কেনে টাকা দিতে যাবে,—কিসের লেগে? লাগ্ লাগ্-ভেল্‌কি লাগাতে গেলি কেনে? লালিশ-মর্কর্দমা করতে গেলি কেনে?"

"ট্যাঁক-ট্যাঁক্ করিস না; তুই চুপ কর্ শালী, তুই চুপ কর্।"

এই বলিয়া গণেশ তাহার ভাদ্র-বধূকে চুপ করাইয়া দিয়া কিশোরীকে একটুখানি বাহিরে ডাকিয়া আনিল।

"আমার তো এরই মধ্যে বিঘে-চারেক গেল,—দে তুইও দে চার বিঘে।"

কিশোরী কিছুতেই রাজি হয় না। বলে,—"খাব কি দাদা? জমি যে মোটে সাত বিঘে।

গণেশ বলিল, "এ সময় তা বললে চলে না, আমারই কোন্ পঞ্চাশ

বিষে। জেল-কয়েদ না হয় খাটতে রাজি আছি—কিন্তু নেমেছি যখন, শেষ পর্যন্ত লড়বই। আমরা জাত কম্বুজ্য। আমাদের রাগ ভারি খারাপ।"

কিশোরীকে রাজি হইতে হইল।

"কিন্তু নেবে কে ?"

গণেশ বলিল, "আমি নেব। আবার কে নেবে ? লেনেওয়ালা-মরদ আবার কোন্-বেটা আছে রে এ-গাঁয়ে ? ......জমি তুই চৈতনের মায়েব নামে লিখে দিবি। বাস্। জমি দিয়েই খালাস! নালিশ করতে হয়, আপিল করতে হয় আমি করব। মোকর্দমা চালাতে হয়—আমি চালাব। চুরি কবতে হয়, ডাকাতি কবতে হয়—হাম্ করেঙ্গা। আলবাৎ করেঙ্গা।—"

দিন-দুই পরে একদিন শহরেব বেজেস্ট্রি-আপিসে গিয়া জমি চার বিঘা কিশোরী লিখিয়া দিল বটে, কিন্তু বাকি তিন বিঘা জমিতে কি করিযা যে কি হইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। বলিল,— "শোন্ দাদা শোন্ তবে এক মতলব শোন্ আমার। যা হবে তা একবারেই হয়ে যাক। দিই ফুটিয়ে, চল একদিন নবনেকে শেষ করেই দেওয়া যাক। বাস্ .হয় এস্পার, নয় ওস্পার!"

প্রস্তাব শুনিয়া গণেশ পাঁড়ে লাফাইয়া উঠিল।

"ঠিক! ঠিক বলেছিস। জ্বালা-জঞ্জাল চুকে-বুকে যাওয়াই ভালো। বাহা রে! বাহা রে!"

তৎক্ষণাৎ তাহাদের পবামর্শ ঠিক হইয়া গেল এই—যে, হাবু রায় তাহাদের নামে যে মোকর্দমাটি রুজু করিয়াছে, আগামী মঙ্গলবার তাহারই শেষ-শুনানির দিন। নবীন আদলতে যাইবেই এবং সন্ধ্যার ট্রেন ভিন্ন সে যে ফিরিতে পারিবে না ইহাও ঠিক। গণেশ

কিশোরী তাহার আগেই আদালত হইতে চলিয়া আসিবে। হিঙু-লের তীরে গাছ-পালার ঝোঁপ-জঙ্গলের আড়ালে দু-তিনটা লোক লাঠি-সোটা লইয়া অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। তাহারাও থাকিবে। স্টেশন হইতে গ্রামে ফিরিবার ওই একমাত্র পথ, সুতরাং নবীনকে সেই রাস্তা দিয়া আসিতে হইবেই। হোক না জ্যোৎস্না-রাত্রি।

গণেশ বলিল, "অমন চাঁদ আমি কত গণ্ডা দেখেছি। চাঁদ-সূর্যি দুজনাই থাক না বাবা। ঠিক— বাঘে যেমন করে, শিকেরটি ধরে নিয়ে যায়, মুখে কাপড়টি চেপে দিয়ে, ঠিক তেমনিটি করে নিয়ে যাব—উ-ই পেসাদপুরের ডাঙ্গায়। তারপর খুবলে খুবলে কাটব, কেটে বস্তায় পুরব, পুরে হিঙুলের চোরাবালিতে পুঁতে দিয়ে—বাস্, হাত-পা ধুয়ে বাড়ী ফিরব। জ্বালা জঞ্জাল চুকে যাবে এক—দিনে।"

শশী গোড়ল আবার আসিল।

বলে, "চাষ করব আজ্ঞে—আবার।"

কুঁড়ি ধরিবার আগে বেলফুলের গাছগুলি সীতাপতিবাবু একবার ছাঁটিয়া ফেলিতেছিলেন। গাছ-কাটা প্রকাণ্ড কাঁচিটা থামাইয়া শশীর মুখের পানে তাকাইয়া কহিলেন, "তুই সবই করবি।"

পশ্চিমমুখে শশী দাঁড়াইয়াছিল। সূর্যের আলো তাহার মুখে আসিয়া পড়িতেই সে তাহার একটুখানি কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, "না হুজুর, নিশ্চয় করব আমি। জমিটি আপনি আর-

একবার দিন। কিন্তু এবার আব আলু-পেঁয়াজ নয়, এবার কচু বিষেয তিন-শটি টাকা লাভ।"

সীতাপতিবাবুর হাতেব কাঁচি আবার চলিতে লাগিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "লাভ যা করবি তা আমি জানি। এ বুদ্ধিটি কে তোর মাথায় ঢোকালে বল্ দেখি ?"

শশী বলিল, "শ্বশুববাডী গিযেছিলাম হুজুর, আজই তো ফিরছি সেথান থেকে।"

সীতাপতিবাবু আবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তাই বল।"

"আজ্ঞে হাঁ, এই ধান-চালেব সমযটা মেযেছেলে সব বেখে দিযে এলাম সেইখানে। সুমুন্দিকে বললাম বলি, শুনছো হে ভায়া, এখন আর এদের নিযে যেতে পাবব না আমি, মামাব ঘবে দিনকতক থাক ছেলেপুলেগুলো। বুঝলেন? তাতে সুমুন্দি বললে কি — বেশ তো বেশ তো। আমিও বাঁচলাম হুজুব। খেযে-মেখে দিনকতক টিস্‌কিযে আসুক। আমাব সুমুন্দির—বুঝলেন হুজুর—তিনখানা নাঙলেব চাষ। ইযা বড বড চার-পাঁচটা ধানের মরাই ঘবের উঠোনে। চাব জোডা চাষেব বলদ—বেটাদেব শরীল কি হুজুব। কচুব চায কবে গেল-বছব চাব-শ টাকা পেয়েছে আমার শালা—"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "বেশ তাই. কচুব চাষই কর। গরুতে ছাগলে কচু খায় না বটে কিন্তু যদি মানুষে খায় ?"

শশী বলিল "মাঠে কুঁড়ে বাঁধব হুজুর! এবার তো পেছটান নাই, গায়ে আমার বাতাস লাগবে আজ্ঞে! আপদগুলোকে বিদেয় করে এলাম তো শুধু সেই জন্যেই।"

একটুখানি ভাবিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, "জমি তো ওখানে আমার

অনেকখানিই আছে,—খানিকটা তুই কর্, খানিকটা আমি করি। লোকে চুরি করতে তাহলে একটুখানি ভয় করবে।”

আনন্দে শশীর মুখ দিয়া আর কথাই বাহির হইল না।

গাছ কাটা তখন প্রায় শেষ হইয়াছিল, কাঁচিটা রাখিয়া দিয়া সীতাপতিবাবু বলিলেন, “চল্ জমিটা একবার দেখেই আশা যাক।”

শশী প্রস্তুত হইযাই ছিল, বলিল, “চলুন আজ্ঞে। কালই আমি তাহলে একটা চিঠি লিখে দেব শালাকে। পোস্টাপিস—নযান্‌কলমি। জেলাটা কোন্ জেলা হবে তাহলে হুজুব ?”

সীতাপতিবাবু বাহিব হইযা পডিলেন। বলিলেন, “দেখে বলে দেব। চল।”

পথ চলতে চলতে শশী বলিল, “এসে তো দেখছি, গাঁয়ে খুব লালিশ-মকর্দমা লেগে গেছে হুজুর,—আবাব শুনছি নাকি আপনাব সঙ্গেও—”

“হাঁ, আমাব সঙ্গেও।”

শশী বলিল, “মববাব আগে পিঁপডেব ডানা বাঁধে আজ্ঞে, এইবার মববে ঠিক। আব দেখুন, সেই যে আমাব আলু-পেঁয়াজ চুরি,—সে আব কাবো কাজ নয় হুজুব,—ওই ওরাই।”

সন্ধ্যার ট্রেনে নবীন আব সেদিন আদালত হইতে ফিরিল না, বোধ করি রাত্রির ট্রেনে ফিবিবে।

লাঠি, কুড়ুল ও একটা তলোয়াব চৈতন ঠিক সমযেই হিঙুলের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটার পাশে বাসক-বোয়ানের ঝোপের তলায় আনিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু উঠাউঠি দুইটা ট্রেন পার হইয়া গেল—নবীন আসিল না ; গণেশ-কিশোরী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

মাটি ও গাছের কথা উঠিলে সীতাপতিবাবুর জ্ঞান থাকে না। হাতের উপর এক মুঠা মাটি তুলিয়া লইয়া আঙুল দিয়া গুঁড়া কবিতে করিতে তখনও তিনি শশীকে বুঝাইতেছিলেন. "বীজ যদি পুষ্টলো হয়, আর একটুখানি সাব গোবর পড়ে এই মাটিতে,—বাস্, তাহলে আর দেখতে হবে না, গাছকে ঠিক মাথা ভুলে উঠতেই হবে—ফন্ ফন্ করে ঠিক সাপের মত উঠ্‌বে, তেজ কি হবে গাছের !···আসল কথা হচ্ছে, মাটিকে একটুখানি আদর-যত্ন করতে হবে। ভালো না বাসলে কেউ কিছু দেয় না শশী, কাবও কাছ থেকে কিছু পাওযা যায না·· মাটিই বা তাকে ফলটি কেন দেবে বল্ দেখি, কেন দেবে সে ?"

কথা কহিতে কহিতে হিঙুলেব উপব দিয়া তিনি বাড়ী ফিবিতেছিলেন।

নদীটি তখনও একেবাবে শুকাইযা যায নাই, এবং সেই সামান্য জলেব উপর উভয় তীবের বড-ছোট নানা বকমেব গাছেব সাবি শাখা-প্রশাখা বিস্তাব কবিযা বহুদুব পর্যন্ত ঝুঁকিযা পডিযাছে। প্রকাণ্ড একটা শিবিস গাছে বিস্তব ফুল ফুটিযাছিল।

দূরে একটা গাছেব আডালে তখন চাঁদ উঠিতেছে।

সীতাপতিবাবু সেইখানে দাঁডাইলেন। বলিলেন, "নদীটা এইখানে বাঁধতে হবে শশী ! আব এই শিবিস গাছেব তলায় চুযো খুঁড়ে একটা টেঁড়া বাঁধলেই মাঠে জল যাবে—কি বলিস ?

ঘাড় নাড়িয়া শশী বলিল, "সে-সব আমি ঠিক করে নেব হুজুব—!"

সীতাপতিবাবু গাছগুলাব দিকে তাকাইযা ছিলেন। বলিলেন, "দাদার বুদ্ধি দেথ দেখি ? বলে কিনা—হিঙুলের গাছগুলো কেটে বিক্রি করে ফেল ! তাই কাটে ? তাই কাটে কখনও ? কেটে দিলেই

তো সব ছ্যাড়া বুঁচো হয়ে গেল—রইল কি ? ছোট হোক, বড় হোক, মাটিতে যে একবার জন্মালো তাকে আর···কে ! কে !···”

পাশের একটা ঝোপের আড়াল হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল।

সীতাপতিবাবুকে দ্বিতীয় প্রশ্নের অবসর না দিযাই গণেশ লাঠি চালাইল।

“লাগা তবে এই শালাকেই লাগা।”

কিশোরীও লাঠি তুলিল।

ডান হাতখানি তুলিযা দিযা সীতাপতিবাবু মাথা বাঁচাইলেন।

কিন্তু হাত ভাঙিল।

“ঈ—স” বলিযা থর থর করিযা কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সেইখানেই বসিযা পডিলেন।

শশী তখন প্রাণপণে চীৎকার শুরু করিযাছে—

“ওরে মেরে ফেললে রে ! কে আছিস রে ! ডাকাত রে। ছুটে আয ! আয।”

গণেশ তাহাকে চুপ করাইবার জন্য দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে এক লাঠি মারিল, কিন্তু সে চুপ করিল না; মার খাইযাও চেঁচাইতে লাগিল।

কিশোরীও তাহার উপর আর এক লাঠি চালাইল।

কিন্তু তবু চীৎকার থামিল না।

তলোয়ারখানা হাতে লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, “চলে আয বেটা, এগিযে আয ! এগিযে আয় !”

হাতিয়ার লইয়া চৈতন আগাইয়া আসিতেই গণেশ বলিল, “লাগা, এই চাষা-বেটাকেই আগে লাগা। শালা চেঁচায়।”

চৈতন চোট চালাইল।

শশীর পায়ের মাংস খানিকটা ঝুলিয়া পড়িতেই সে আরও জোরে চীৎকার শুরু করিল।

গণেশ তাহার মুখখানা চাপিযা ধরিল। বলিল, "লাগা এবাব!"

কিশোরী চৈতন দুজনেই একসঙ্গে তাহাকে একেবারে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু চীৎকার তাহাব ব্যর্থ হয় নাই। স্টেশন হইতে কতকগুলো লোক বোধ করি সেই পথ ধবিযাই আসিতেছিল, হিঙুলেব ও-পারে সহসা তাহাদেব হল্লা শুনিতে পাওয়া গেল।

আদালত হইতে সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিযা নবীন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন যে হইবে তাহা সে কোন দিন ভাবিতেও পারে নাই।

সীতাপতিবাবু খাটেব উপব শুইযা ছিলেন। হাতে তাহার সেক দেওয়া চলিতেছিল। ডাক্তার আনিবাব জন্য স্টেশনে লোক গিয়াছে। ফটিক শুধু শিযবের কাছে চুপ কবিয়া বসিয়া একদৃষ্টে দাদুর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল।

বাহিরে আর একটা খাটের উপব শশীর শুশ্রূষা চলিতেছে।

নবীনকে দেখিয়া সীতাপতিবাবু বলিয়া উঠিলেন, "শেষ পর্যন্ত এই হল বাবা বুড়ো বয়সে—"

গলাটা তাহার বন্ধ হইয়া আসিল। চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

নবীনের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। পাশের ঘরে

তাহাদের পাশ-করা দো-নলা বন্দুকটি থাকিত। নবীন ঘরে ঢুকিয়া টোটা সমেত ধীরে-ধীরে তাহাই বাহির কবিয়া আনিল।

বন্দুক দেখিয়া সীতাপতিবাবু চমকিয়া উঠিলেন।

"কি হবে, কি হবে, ও কি হবে কি ?"

"কিছু হবে না।" বলিয়া নবীন দরজা খুলিযা বাহির হইয়া যাইতেছিল।

"নবীন !"

সীতাপতিবাবু বিছানা হইতে মাথা তুলিযা একবাব উঠিবার চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু পাবিলেন না,—বালিশেব উপর মাথাটা আবার লুটাইযা পডিল। আবাব ডাকিলেন—

"নবীন! নবীন!"

নবীন ফিরিয়া দাঁডাইল। বলিল, "গুলি কবব। ওদের প্রত্যেককে খুন কবব আজ—মেযে ছেলে সব—।"

মাথা নাডিযা সীতাপতিবাবু ডাকিলেন "শোন।—কাছে আয়।"

বহুকাল পবে এত বড স্নেহের আহ্বান নবীন আজ আর প্রত্যাখ্যান করিতে পাবিল না কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বাখ—বন্দুক রাখ। ছি—।"

নবীন বলিল, "কেন মিছে—আপনি জানেন না।"

সীতাপতিবাবু কহিলেন, "জানি। মানুষ খুন করার চেয়ে বড় পাপ আর দুনিয়ায় কিছু নেই—জানি আমায খুন কবেছে—এর শাস্তি—ওদের ভগবান দেবেন।"

রাগে নবীনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিগাছিল, নিজেকে সে আর সামলাইতে পারিল না, বলিল "ভগবান নেই!"

চওড়া বুকখানা তাহার ঘন-ঘন দুলিতে লাগিল।

সীতাপতিবাবু আবার তেমনি ধীর শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "আছেন···নবীন বিশ্বাস কর···আছেন।"

বলিয়াই তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া চোখ বুজিলেন।

একটুখানি থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "নালিশ-মোকর্দমা যেমন চলছে চলুক। আমার···আমার মনে হয়···তাও চালিয়ে কাজ নেই।"

নবীনের আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে ভালো লাগিতেছিল না, বলিল, "এক্ষুনি চললাম।"

"কোথায় ?"

নবীন বলিল, "পুলিশ-সাহেবের কাছে। ওদের চালান দিতে হবে। এ্যারেস্ট করাতে হবে।"

সীতাপতিবাবু বলিলেন, "এইমাত্র এলি, আজ না বাবা—কাল যাস।"

"না। এক্ষুনি—আজ রাত্রেই।—মহতাপ্ !" দরজা খুলিয়া নবীন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সমস্ত গ্রামের আবহাওয়া সে এক অত্যাশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেছে।

রাস্তার ধারে শিব-দেউলের সেই উঁচু রকের উপর নবীন সেদিন চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—হাতে একটা বেতের চাবুক। আজকাল এই চাবুকটা তাহার হাতেই থাকে। কাহারও সহিত বড়-একটা কথা কয় না।

কেনারাম মুখুজ্যে সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিল নবীনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চোখ মিট মিট করিতে করিতে বলিল, "বসে আছ বাবা ?"

নবীন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল "হুঁ।"

মুখুজ্যে বলিল, "টিকেওয়ালা এসেছে আমাদেব গাঁয়ে। বলে ছেলে-বুড়ো সব টিকে নিতে হবে—শহরে বসন্ত হচ্ছে। আরে শহবে বসন্ত হল তো আমাদেব কি? আমরা বলে নিজের জ্বালায় অস্থির—টিকে নিচ্ছে! আর সে রকম টিকেই বা এখন পাবে কোথায? সে সব বাংলা-টিকে—আমাদের আমলে ছিল। এই ছাখো—দাগ এখনও জ্বল জ্বল কবছে। কাঠে আগুনে না হওয়া পর্যন্ত এ দাগ আর সহজে উঠছে না বাবা!"

সে তাহাব বাঁ হাতেব উপব বসন্তের একটা টিকাব দাগ নবীনকে দেখাইয়া দিল। বলিল, "শুনছি নাকি ছেলেগুলোকে জোব কবে ধবে-বেঁধে টিকে দিয়ে দিচ্ছে। কেন বে বাপু? এত ভালো তোব কবে কাজ কি? যাব হবে তার হবে। কপালে যাব আছে তাব হবেই, টিকে দিলেও হবে না দিলেও হবে।—দেখা হলে তুমি একবাব ওকে বাবণ করে দিও তো বাবা! বলো, আমাদেব গাঁয়ে টিকে কেউ নেবে না—তুমি যাও। ছেলেগুলো আমাদের ভযে মবছে, কাল থেকে এক বকম ঘবেই পোবা বযেছে—বেবোতে পাযনি, বুঝলে? তাতেও না যায, আমি দিযে আসব এক নম্বব নালিশ করে ওব নামে,—জোব কবে টিকে দেওযা ওব বাব কবব।" বাগেব ঝোঁকে অবস্থা তাহাব অত্যন্ত খাবাপ হইযা আসিল।

কেনারাম চলিয়া যাইতেছিল, পুনবায ফিবিযা আসিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "হ্যাঁ ভালো কথা। যে জন্যে এলাম সেই কাজটাই ভুলে যাচ্ছি।—আচ্ছা, উকিল মুক্তিয়াররা কি বলে? বেটাদের সাজা-টাজা কিছু হবে? জন্মের মতন ডিপ-চালান করে দেয,—তবে তো জানি হ্যাঁ হল কিছু। দিনের পর দিনই তো শুধু পড়ছে, বেটারা বিচের-টিচের করতে জানে না, না কি!"

নবীন চুপ করিয়া রহিল।

কেনারাম আবার বলিল, "ও-সবের দফাটি একেবারে নিকেশ করে দেওয়াই ভালো, বুঝলে বাপ। এতে পাপ নেই। দেবতার থানে পশু বধ করি আমরা—এও সেই পশু বধেরই সামিল।"

বিষণ দে পার হইয়া যাইতেছিল, নবীনকে দেখিযা সেও একটি নমস্কার করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল।

"বসে আছেন আজ্ঞে?"

নবীন বলিল, "তোমার মনে আছে তো বিষণ? পরশু তোমাব সাক্ষীব দিন আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আমি দেওয়ালেব উপর গোবর দিয়ে ডাঁড়ি কেটে বেখেছি আজ্ঞে। আমাব ছেলেই সব ইঞ্জিবি তাবিখ টাবিখেব খবর বাখে,—যতই হোক, পেটে দু-আখর পডেছে তো—না, কি বলেন মুখুজ্যে? এই চারটি আম আনতে গিযেছিলাম—দীনুব কাছে।"

বিষণ তাহাব খাটো কাপডের খুঁটে বাঁধা আমগুলি দেখাইয়া বলিল, "কচি আমেব গুড-অম্বল খেতে বেশ, কিন্তু এ বচ্ছর কি আর খাওয়া হল কিছু—এই হেঙ্গামা নিযেই গেল। কচি নিমেব পাতা ভেবেছিলাম খাব, কিন্তু আব হল কই? সেদিন দেখি না আশু নাপিতের গাছেব পাতাগুলি সব এবই মধ্যে বড হয়ে গেছে। আর আমগুলো কি আর কচি আছে? এই দেখ না—আঁটি বেঁধে গেছে এরই মধ্যে।"

কেনারাম তাহার ঝাপসা চোখের সুমুখে আমটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আর না বাঁধে? গাছের ফলেরই বা দোষ কি? চোত পেরিয়ে বোশেখে পডতে চললো,—দেখতে দেখতে কি বকম গরম পড়েছে দেখেছ?······দাও, একটা যখন দিলে তখন আর

ছুটোই দাও! তরকারির সুখের তো আর সীমে নেই,—গুড়-অম্বল আমারও হোক……”

বৈশাখ মাস ব্রাহ্মণ মাস।

গ্রামের ছোকবাব দল খোল কবতাল বাজাইয়া হরিনাম সংকীর্তন করিতে কবিতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমস্ত গ্রামখানাকে মাতাইয়া তোলে, গাঁয়েব পথে পথে সকলে মিলিযা নাচিয়া নাচিযা ঘুবিযা বেড়ায়।

অঘোর দালালের খোল কবতাল সম্বৎসব ধবিযা দেওয়ালের গায়ে টাঙানো থাকে, এই সময ধূলা ঝাড়িযা তাহাদেব নামানো হয়। কিন্তু সে বৎসব দেওযাল হইতে তাহাবা আর নামিল না।

মনু পৈতণ্ডী তাহাকে সংকীর্তনেব কথা বলিতে গিয়াছিল। অঘোর বলে, “দিনের বেলায় বিবেনো গাঁযে কাপড় বেচতে যেতাম তা-ই ছেড়ে দিলাম ;—এ তো বাত! ও-ই তোলা আছে, বাজাতে পার তো নিয়ে যাও।”

সেদিন খঞ্জনিদাব বাখু বোবেগী বলিল, “বাত বিরেতে আমি আর বেবোই না দাদা! সন্ধ্যে হলেই আমাব ঘবে খিল পড়ে—তুমি না হয় দেখে যেও একদিন।”

বেনোয়ারী ওস্তাদ তাহাব এক মাসীব বাড়ীতে মাসাধিক কাল বসিযা আছে। লোকে জানে, যাত্রার দলে ঠিকা-চুক্তিতে এখনও তাহার বেহালা বাজানো চলিতেছে।

পাঁড়ে-পাড়াব পাশে পুরানো একটা অশ্বথ গাছের তলায পাতল-ফোঁড় পাথরের একটি শিব আছেন—ফণী-মনসা কাঁটাব বেড়া দিয়া ঘেরা। বৈশাখের শেষ দিন; অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া, গ্রামের ছেলে বুড়া সকলেরই এই শিবের মাথায় এক ঘটি করিয়া জল ঢালিয়া বুড়া-বাবাকে

ঠাণ্ডা করিয়া আসিতে হয়। না আসিলে গ্রামে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে, আকাশে মেঘগুলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায়, মেঘে জল থাকে না, অনাবৃষ্টির দরুণ আবাদী জমিগুলি চাষের সময়ও শুকনো-ডাঙ্গার মত খাঁ খাঁ করিতে থাকে।

ঘরের কাছে পাইয়া গণেশ কিশোরী যে কাহাকেও বাদ দিবে না একথা ঠিক, অথচ বৈশাখের সংক্রান্তি আসন্নপ্রায়; নবীনের কাছে ঘন-ঘন লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হইল।

নবীন বলিল, "আমি কি করব? দুর্ভিক্ষ হয় তো হোক।"

আশু মুখুটী বলিলেন তোমার কি বাবা অ-ঢেল টাকা পয়সা, দুর্ভিক্ষ হলে আমাদেরই সর্বনাশ। তার চেয়ে আমি বলি কি, গাঁয়ে একটি ঢোল-সরহদ্দ করে দাও—যে, সেদিন পূব্ দিকে সূয্যিটি ঠিক লাল বরণ হবে আর সব ঠিক এক সঙ্গে—ছেলে বুড়ো সব ঠিক একই সময়ে—এক জোট হয়ে ঘড়ির ঠিক কাঁটায় কাঁটায়···বাস! মার খায় তো খাবে সব এক সঙ্গেই! আর এতগুলো লোক থাকব আমরা—মার অমনি সুখের কথা কিনা! মার যেন কত পড়ে থাকে পথের ধুলোয়!···"

নবীন কোনও কথাই বলিল না।

হাবু রায় কাছেই ছিল, বলিল, "আপনার মাথায় তো এই বুদ্ধি হল, আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি দেখুন—।" এবং ঠিক সে করিয়াও দিল।

সেই দিনই ষোল-আনা গ্রামের লোকের সহি লইয়া মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কাছে এই বলিয়া একটি আর্জি পেশ করিয়া আসিল যে, আগামী বৈশাখ সংক্রান্তির দিন গ্রামে তাহাদের একটি

উৎসব আছে। উৎসবটি তাহাদের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের অনুষ্ঠিত এবং সে উৎসবটি যাহাতে না হয়, গ্রামের দুষ্ট ব্যক্তি গণেশ ও কিশোরী পাঁড়ে ভিতরে-ভিতরে তাহারই আয়োজন করিয়াছে। তাহাদেরই দরজা দিয়া সেদিন সকলকে পার হইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং গ্রামের মধ্যে ভীষণ একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি-উপদ্রবের আশঙ্কা আমরা সকলেই করিতেছি। উক্ত দিবস হুজুর যদি সশস্ত্র পুলিশ কর্মচারী দিয়া গ্রামের দরিদ্র প্রজামণ্ডলীকে সাহায্য না করেন তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

সংক্রান্তির পূর্বরাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই মহকুমা হইতে পাঁচ-জন বন্দুকধারী সিপাহী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালো রঙের মোটা চামড়ার বুটজুতাগুলা তাহাদের পায়ে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করিয়া ডাকিতেছিল।

এবং সেই সিপাহী পরিবৃত হইয়া গ্রামের লোক নির্বিঘ্নে সেদিন বুড়া-শিবের মাথায় জল ঢালিয়া আসিল।

ফিরিবার পথে পানু গাঙ্গুলী একজন সিপাহীর অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়াই চলিতেছিল। গণেশ পাঁড়ের দরজার কাছাকাছি আসিয়া সিপাহীকে সে অত্যন্ত সন্তর্পণে অথচ জোরের সহিত কহিল, "ওটা কি তুমি আমাদের দেখাবার জন্যে এনেছ নাকি? দাও না, এইখানে ফুটিয়ে দাও না একটা, আওয়াজ হোক, বেটা চমকে উঠুক।...কি হে। তোমরা কোনও কাজেরই নও দেখছি যে ..."

যে কোন রকমেই হোক, বুড়া-শিবের মাথায় জল সে বৎসর অনেক পড়িল, কিন্তু তথাপি দরিদ্র গ্রামবাসীর উপর রাগ যে তাঁহার কেন পড়িল না কে জানে!

জ্যৈষ্ঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আকাশে মেঘ আছে, অথচ বৃষ্টি নাই। গ্রামের অনেক পুকুর শুকাইযা গেল। পানীয়ের অত্যন্ত অভাব। চারিদিক খাঁ খাঁ করে। দুপুরে আগুনের হলকা বয়।

মাঝে মাঝে যৎসামান্য যে বৃষ্টিটুকু হয়, মাঠে লাঙল দেওয়া দূরে থাকুক—পথের ধূলাও তাহাতে ভিজে না।

সে বৎসর সকলকেই যে না খাইযা শুকাইয়া মবিতে হইবে সে-আশঙ্কা অনেকেই করিতে লাগিল এবং ইহা যে শুধু এই হতভাগা পাঁড়েদেব পাপেব মাত্রা অত্যন্ত বেশী হইযা উঠিয়াছে বলিয়াই—ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার কবিল।

বৃষ্টি নামিল আষাঢেব প্রথমে। কিন্তু জলো-হাওয়াব আমেজ লাগিযা হাকিমদেব মাথাগুলাও ঠিক এই সমযেই সাফ হইযা গেল। ঘন ঘন মোকর্দমার দিন পড়িতে লাগিল।

ষষ্ঠী নিয়োগী সেদিন নবীনকে বলিল, "কাউকে কিছু ঘুষ-টুষ দিযে মোকর্দমার দিনগুলো এই সময় কিছু কম-সম কবে ফেলাও ভায়া, একে নামি চাষ, তাব উপব মাঠ-ঘাট যদি দেখতেই না পাওয়া গেল, তাহলেই তো দফাটি আমাদেব কাবাব।"

নবীন বলিল, "জানি নে। আমায কেউ কিছু বলতে এস না ভাই এ-সময়, কারও কথা আমি রাখতে পাবব না। মোকর্দমা শেষ হোক, তারপর যা হয হবে।"

"শেষ হতে-হতেই যে…"

নবীন বলিল, "তোমাদের ভালো করতে গিয়েই আমার এই বিপদ। তোমাদের জন্যেই বুড়ো বাবাকে মার খাওয়ালাম……তোমাদের জন্যেই…" বলিতে বলিতে গলাটা তাহার ধরিয়া আসিল।

হরি মাইতি সেদিন তাহাব কৃষাণকে সঙ্গে আনিয়া নবীনের কাছে আসিয়া পড়িল।

"দেখুন বাবু, কাজ দেখুন ব্যাটার। আদালতে সেদিন যাবার আগে এই বেটাকে বলে গেলাম, জমির বসে রসে এই সময় চাষ দিয়ে বাখিস। বাস্। ফিরে এসে দেখি, কোথাকার কি, কোথায় চাষ, কোথায লাঙল—নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে বেটা। মাঠের 'বতর' শুকিয়ে কাঠ হযে গেছে হুজুব, আপনাব দাযে আমার সব গেল···এই নালিশ-মকর্দমার জন্য······"

হাতের বেতখানা তুলিয়া লইয়া নবীন লাফাইয়া উঠিল, "বেবো হাবামজাদা, আমাব সুমুখ থেকে বেবো—! যেতে হবে না তোকে আমার সাক্ষী দিতে, হাবামজাদা, পাজি, ছুঁচো, স্টুপিড! আমার দাযে? চাষ গেল আমাব দাযে? গাধা, স্টুপিড···"

নেপাল মুচিব অসুখ গত কযেকদিন হইতেই একটুখানি বাড়িয়াছিল। আষাঢেব শেষাশেষি হঠাৎ একদিন বাত্রিবেলা কাশিতে কাশিতে মুখে রক্ত উঠিযা সে মারা গেল।

তাহার মোকর্দমাব বিচাব তখনও শেষ হয় নাই।

গ্রামের দু-চাবজন লোকেব মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, গণেশ যখন তাহাকে থামাবে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মারিতেছিল, সেও তখন গণেশকে দু-এক ঘা বসাইয়া দিতে কসুর করে নাই, এবং হাজার হোক, মুচি হইয়া ব্রাহ্মণকে মার,—ছ-মাস পার হইল না, মুখে রক্ত উঠিয়া শেষ হইয়া গেল···

এবং এই মারের ব্যাপাবটা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে; এতদিন কাহারও কাছে প্রকাশ কবে নাই, নেপাল শুধু বাঁচিয়াছিল বলিয়াই।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে আদালতে নেপালেব মোকর্দমা আবার উঠিল। নেপাল মুচিব ও গণেশ পাঁড়ের ডাক হইল। নেপাল সে ডাক শুনিতে পাইল না, কিন্তু বিচাব তাহার সেইদিনই শেষ হইয়া গেল। গণেশকে কুড়ি দিন জেল খাটিতে হইবে।

সংবাদটা যখন গ্রামে আসিয়া পৌছিল, নেপালের বৌ তখন দিন-আট-দশ জ্বরে ভুগিয়া সবেমাত্র সারিয়া উঠিয়াছে।

গণেশেব জেলেব খবর হরেকিষ্ট রাখহরির কানে পৌছিতে দেরী হইল না, নবীনেব কাছে তৎক্ষণাৎ তাহাবা যেন হাওয়াব বেগে ছুটিয়া আসিল।

রাখহরি বলিল, "যাবে কোথায ভায়া, ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে। আমাব বেলায় না হয় ফস্কালে কোন বকমে, কিন্তু এবাব—!"

হরেকিষ্ট সে কথা বলিল না। বলিল, "কুড়ি দিন—এমন আব কি বেশি হল আজ্ঞে! দু-দুটো বাঘে খেযে এলে যায় ওর ওই হাতীর মত শরীর,—কুড়ি দিন ঘানি টেনে কি আব এমন ঝট্‌কাবে হুজুব?"

"আচ্ছা হোক, হোক, ফিবে তো আসবেই,—ফাঁকে যে আমি ওকে পাচ্ছি না কোনদিন।"

মহতাপ্ কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল।

নবীন তাহার দিকে মুখ তুলিযা চাহিতেই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বলিল, "ও।—আচ্ছা রাখহরি, তোমার ঘর থেকে শলিখানেক চাল আজ আমায় ধাব দিতে পাব? কাল-পরশু দিয়ে দেব।"

তৎক্ষণাৎ রাখহরি জবাব দিল, "ওইটি মাপ করবে ভায়া, থালা, ঘটি, বাটি, সাবল, কুড়ুল, কোদল, ফাল, যা-কিছু চাও দিতে পারি, কিন্তু চা—ল ভায়া, চাষের অবস্থা তো এবছর হটটম্বা, তাব উপর ওই যে আমার বঙ্কিমানন্দ ভায়া, ওই যে ক্যাপা সেজে থাকেন, চাল-ধান সব

বেচেখুচে হুদ্দেফুটো ধরিয়ে দিলে। চাল কি হবে ভায়া? তোমার আবার চালের কি দরকার?”

হরেকিষ্ট জিজ্ঞাসা করল, “দর-বিশ সেব চাল—এ তো, যেদিন খুশি··· যখন খুশি···চাল আপনি কি করবেন আজ্ঞে?”

নবীন সে কথার কোনও জবাব দিল না। মহতাপ্‌কে বলিল, “যাও, সজনী দত্তর দোকানে যাও, বুঝলে? আমাব নাম কবে বল গিয়ে তাহলেই দেবে। তারপব নিজে গিযে পৌঁছে দিযে এস ওব ঘরে। বলো যে তুই ভাবিস নে, কিচ্ছু ভাবনা নেই তোব।”

মহতাপ্ চলিযা গেলে বাখহবি প্রশ্ন কবিযা বসিল, “কে, কে, কাকে ভাযা কাকে?”

নবীন অত্যন্ত বিবক্তিব স্ববে বলিল, “কাউকে না।”

বলিযাই সে গুম হইযা বসিয়া রহিল।

কথাটা পাল্টাইযা দিবার জন্য রাখহবি তৎক্ষণাৎ ঈযৎ হাসিযা কহিল, “কুড়ি কুড়ি দিন মেযাদ হল ভাযা,—নেপা-বেটা বেঁচে থাকলে বেশ হত কিন্তু···”

জেল হইতে ফিবিযা গণেশ এবাব খুব বেশি আস্ফালন করিতে পারিল না।

স্ত্রী বলিল, “চাল ধান টাকা পযসা ঘবে আর একটি নেই—তুমি কযেদ খাটো আব আমবা উপোস দিই।”

গণেশ বলিল, “তুই আম্রাব বৌ-ই নস হাবামজাদী, আমার কাছে বললি সে-ই ভালো, খববদাব আব-কাবও কাছে বলিসনে এ কথা।”

গণেশকে আবার মদনপুরের তাবিণীবাবুর কাছে ছুটিতে হইল। বাকি পনেব বিঘা জমির মধ্যে দশ বিঘা আবার বন্ধক পড়িল।

নগদ পাঁচ-শ টাকা হাতে পাইয়া গণেশ বলিল, "বড় মোকর্দমাটা কেমন করে ফাঁসিযে দিই এইবাব তুই গ্যাখ্‌ বসে বসে।"

চৈতনের মা বলিল, "এ-বছর চাষ-টাষ কিছু হয়নি মনে থাকে যেন।"

গণেশ একটুখানি বসিকতা করিয়া তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিল যে, জেলখানার লপ্‌সি-ঘাঁটা তাহাব পক্ষে অতি উপাদেয খাদ্য, চাষ না হইলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই, এবং তাহারা জাত কম্মুজ্যে, চাষ-বাসের ভাবনা তাহাবা ভাবে না।

ছোট-খাট মোকর্দমাগুলিব বিচাব যখন শেষ হইল গ্রামেব তিনটি দুর্গা প্রতিমায তখন মাটি পডিতেছে। পূজা সে-বৎসব কার্তিকের প্রথমে।

সবগুলা জডাইয়া গোটা-পঞ্চাশেক টাকা জবিমানা গণেশ আদালতে দাখিল করিয়া আসিল।

কিশোরী বলিল, "আমার জরিমানার টাকাটা দিলি না যে দাদা ?"

গণেশের হাত তখন প্রায় খালি হইয়া আসিযাছে বলিল, 'তোব টাকা তুই দিগে, না পারিস জেল খেটে আয আমি খাটলাম কি করে ?"

জবাব শুনিয়া কিশোবীব মনটা ভাবি খাবাপ হইযা গেল বলিল, "তোর সঙ্গে আব যদি কখনও কাজে নামি তো এই—রাম দুই তিন ;"

কিশোরী নিজের কান মলিযা শপথ কবিল।

গণেশ বলিল, "তোর বাপ নাম্‌বে, তোব হাড় নাম্‌বে। আমার হাতে এখনও বড় মোকর্দমা সে খবব বাখিস ? তোরে ট্যাক্‌টেকে বৌ-শালীকে সম্বচ্ছর খেতে দিতে হবে--সে খবর রাখিস ?"

জরিমানার টাকা দিতে না পারিয়া দিন-কতকের জন্য কিশোরী জেলে গেল।

সীতাপতিবাবু হাত-ভাঙা মোকর্দমাটার এজাহার জবানবন্দী প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে, দু-পাঁচদিনের মধ্যেই যা-হোক একটা-কিছু হুকুম হইয়া যাইবে, এমন সময় গণেশ এক ভারি মজার ব্যাপার করিয়া বসিল।

হাতে টাকা নাই, অথচ বড় দরের একটা উকিল দিতে না পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। বড় আদালতে গণেশ এই বলিয়া এক আর্জি পেশ করিল যে, থানার পুলিস-কনেস্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া মহকুমার বড় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত জমিদারের কাছে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুষ খাইয়াছে, সুতরাং তাহার এই মোকর্দমাটির অন্যত্র বিচার না হইলে তাহার পক্ষে সুবিচারের আর কোনও আশা-ভরসাই নাই।

মোকর্দমাটি দায়রা সোপরদ্দ হইয়া গেল।

দায়রায় তখন একটা ডাকাতি-মোকর্দমার বিচার চলিতেছে। গণেশ দিন কতকের সময় পাইল।

পাঁচ বিঘা জমি মাত্র বাকি, তাহাও আবার ধীরেন ভট্‌চাজের দেওয়া —সঙ্গে একটি ঠাকুর-সেবা আছে। ঠাকুর-সেবার কথাটা বেমালুম উড়াইয়া দিয়া গণেশ আবার তারিণীবাবুর কাছে গিয়া গড়াগড়ি দিয়া পড়িল।

হুজুর না দিলে আর উপায় নাই। পাঁচ বিঘা নাখ্‌রাজ জমি, চার-শ টাকা তাহার চাই-ই। না দিলে মেয়ে-ছেলে লইয়া উপবাস দিয়া তাহাকে মরিতে হয়।

পূজার আগেই জুরির বিচার শেষ হইল।

...জমিদার সাধারণত অত্যাচারীই হইয়া থাকে...এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বড়-একটা হয় না। মোকর্দমাটি আগাগোড়া জমিদারের সাজানো বলিয়াই বিশ্বাস, সুতরাং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন জুরিদের বিচারে আসামী বেকসুর খালাস পাইল।

গণেশ, কিশোরী, চৈতন সেদিন আর পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিল না।

দূরের শহর হইতে ট্যাক্সি-মোটরগাড়ীটা জমিদারের দরজা দিয়া সশব্দে গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, এবং তাহাদের বিজয়োল্লাসে সমস্ত গ্রামখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পূজা আসিল।

লোকজন দেখিলেই হরি কোবরেজের চোখ দিয়ে দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসে। বলে, "পিতিমে পূজো এ-বছর আর হল না দাদা, ঘট-পূজোই হোক! পয়সা-কড়ির বড় টানাটানি।"

বঙ্কিমানন্দ বলে, "ও-বেটির পূজো না করাই উচিত। ওর সেই স্বামী-বেটাই হচ্ছে—বাবার বাবা তস্য বাবা।"

কপিল চক্কোত্তির আনন্দ আর ধরে না বাঁশের কঞ্চি তাহার হাতেই থাকে। বলে "কারও পড়া হয়নি এ-বছর,—কাত্তিক, গণেশ, বাঘ, অসুর, লক্ষ্মী, সরস্বতী—কারও না! পূজোর ছুটিটা এমনিই কাটালে,—পুরনো পড়া, হেণ্ড-রাইটিং,—কিচ্ছু করেনি; সব মার খাবে, মারের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেব আমি— !"

বিজয়া দশমী।

প্রতিমা-বিসর্জন কোন্ সময় গেছে কে জানে!

বিসর্জনের পর গ্রামের লোক ঘরে-ঘরে প্রণাম করিতে বাহির হয়। গ্রামের পূর্বপ্রান্ত তাল তেঁতুলের ছোট একটি বাগানের ভিতর বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ একটি মন্দিরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিণীকে সকলেই প্রথমে প্রণাম করিয়া আসে।

নবীন উঠিল। সিদ্ধির নেশায় মাথাটা তখন তাহার অত্যন্ত ঘুরিতেছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে।

গ্রামের পথে গোকুল চাটুজ্যেব সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রোগা কঙ্কালসার এই লোকটি পড়াশকোলে সামান্য একটি পাঠশালা করিয়া সংসার চালায়।

গোকুল বলিল, "এই যে ভায়া, এস, কোলাকুলি কবি।"

নবীন তাহাব সেই শীর্ণ দেহটি সাগ্রহে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

গোকুল বলিল, "নাঃ পেনাম কবে আব সুখ নেই ভায়া। মিঠাই-সন্দেশ দিতে হবে বলে সব-বেটা দোবে খিল লাগিয়েছে। মোট এই চাব গণ্ডা পাওয়া গেল, আব এই খিলি-দুই পান। চললাম ভায়া তোমাব ঘরেই চললাম।"

"যাও।" বলিযা নবীন আগাইয়া গেল।

পথে আব কাহাবও সাডাশব্দ নাই। ঘবে-ঘবে খিল পড়িয়াছে সত্য। দু-পাশে আগাছাব জঙ্গল। যেখানে-সেখানে ফণী-মনসার ঝোপ। ভাঙা প্রাচীব-ঘেবা পডো বাড়ীগুলা খাঁ খাঁ কবিতেছে।

দূরে মনে হইল গণেশ পাঁডেব দবজা হইতে দুইটা লোক বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেল…

"বেটার আছে কি যে খাওযাবে?"

চাঁদের আলোয় তাদের চিনতে পারিয়া নবীন একবার চমকিয়া উঠিল…রাখহরি ও হরেকিষ্ট।

নবীনকে দেখিতে পাইবামাত্র হরিপদ কামারের গোয়াল-ঘরের পাশে গা-ঢাকা দিয়া দুজনেই সরিয়া পড়িল।

নবীন সেইখান হইতেই ফিরিল। রুক্মিণীর মন্দির পর্যন্ত তাহার আর

যাওয়া হইল না। মাথার ভিতরটা কেমন যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

ইস্কুলের বিদেশী-পণ্ডিতটি পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছেন। তাঁহারই সেই পরিত্যক্ত ঘবের মাঝখানে একটা চেয়ার টানিয়া আনিয়া নবীন চুপ করিয়া বসিল।

খোলা জানালার পথে ঘরেব ভিতর চমৎকার জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে।

দূরের বাউরী-পাড়ায় মাদল বাজাইয়া গান চলিতেছিল। হরি কোবরেজের ঘর হইতে হামান্‌দিস্তায় পান-ছেঁচাব শব্দ আসিতেছে। পাশেই ছিমি-বুড়ির উঠানে প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় ছোট একটা আকাশ-প্রদীপ ঝুলিতেছে।

নবীন এই প্রদীপটাব দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। চোখ দুইটা তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছে। মাথার ভিতরটা ঝিম-ঝিম করিতেছিল।

…মনে হইল, প্রদীপটা যেন দপ্‌ কবিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে বাঁশের বাক্যারি ও রঙিন কাগজের আবরণটা পুড়িয়া গেল! সঙ্গে-সঙ্গে বাঁশের মাথাটাও জ্বলিতেছে…

নবীন সেদিক হইতে মুখ ফিরাইল।

সুমুখে একটা বই-এর আলমারি। তাহার মাথাব উপর রঙিন একটা গোলাকার 'গ্লোব'।

এই গ্লোবখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া স্কুলের ছেলেদের সে অনেকবার বুঝাইয়াছে—আমেরিকা…ইয়োরোপ…এসিয়া…

তাহাদের এই ছোট গ্রামখানি নবীন মনে-মনে খুঁজিতে লাগিল।

মনে হইল, গ্লোবটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। সমস্ত দেশ, মহাদেশ, গ্রাম, নগর—মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল···

আকাশ-প্রদীপের আগুন না জানি কখন আসিয়া বই-এর আলমারিতে লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই আগুন গ্লোবে গিয়া লাগিল ···গ্লোব পুড়িতেছে।

নবীন আর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুমুখের টেবিলের উপর মাথাটা তাহার এলাইয়া পড়িল।

···পুড়ুক্! আর-একটা নূতন গ্লোব আনিয়া দিব।